المنقض من الضلال

আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল

বা

ভ্রান্তির অপনোদন

মূলঃ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহ.)

বঙ্গানুবাদ

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

Bangla Sharif Amin Asif Kazi Md. Sofi
Sunnibiznes.blogspot.com

المنقض من الضلال

আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল

বা

ভ্রান্তির অপনোদন

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)

বঙ্গানুবাদ

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

[বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক]

প্রকাশনায়

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) ফাউন্ডেশন

৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল বা ভ্রান্তির অপনোদন

বঙ্গানুবাদ

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

☎ 0174 10 10 457

প্রকাশনায়

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) ফাউন্ডেশন

৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

☎ 0155 26 00 957

পরিবেশনায়

আবদুর রব খান

রশীদ বুক হাউস

৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০

☎ 01913-493311

প্রকাশকাল

১, জানুয়ারী ২০১২ ইং

© অনুবাদক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া ঃ ১০০ (একশত) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ

জে. পি. কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণ, আল-আকাবা প্রিন্টার্স, ঢাকা

Al-Munquzu Minad Dalal: Written by Hujjatul Islam Imam Gazzali (Rh.). Translated by Muhammad Iqbal Hossain Qadri in Bengali & Published by Hujjatul Islam Imam Gazzali & Baro Pir Abdul Qader Zilani (Rh.) Foundation. 34, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh ☎ 0155 26 00 957

প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্য

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মহানবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর। সেই সাথে তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সাহাবায়েকিরামের প্রতি। একই সাথে স্মরণ করছি সেই সমস্ত মহামনিষীদের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে পেরেছি।

শুধি পাঠকমহল নিশ্চয় ইতঃপূর্বে লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা **হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) ফাউন্ডেশন**, ৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০ নামে নতুন একটি প্রকাশনা সংস্থা গঠন করেছি। আপনরা জেনে আনন্দিত হবেন যে, এখন থেকে ইনশাআল্লাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাবাদী এই সংস্থার পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকবে। একই সাথে ইসলামের এই মহান মনীষীদের বিভিন্ন মূল্যবানগ্রন্থ অনুবাদাকারে প্রকাশ এবং তাঁদের জীবনের নানান খিদমতগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। যাতে করে পাঠকবৃন্দ ইসলামের সঠিক দিক-নির্দেশনা সহজেই লাভ করতে পারেন।

এই ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ঈলমের প্রচার-প্রসার এবং মানব সেবা। সুতরাং এই মহতী উদ্যোগের আপনিও একজন গর্বিত সাথি হতে পারেন। আপনার যাবতীয় খেদমত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আর বিনিময়ে লাভ করবেন পরকালে উত্তম প্রতিদান।

বিনীত

মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
প্রতিষ্ঠাতা
হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ও বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) ফাউন্ডেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ☎ 0155 26 00 957

সূচিপত্র

মহাত্মা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫
ভূমিকা ২০
নানামুখী মতবাদ ২১
জ্ঞানের সংজ্ঞা ২৩
ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ২৪
নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ২৬
সত্যানুসন্ধানীর প্রকারভেদ ২৮
কালাম শাস্ত্র ৩০
দর্শন শাস্ত্র ৩২
দার্শনিকদের বিভিন্ন দল ৩৪
জ্ঞানের বিভাগ ৩৭
লজিক তথা তর্কশাস্ত্র ৪০
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ৪১
অধিবিদ্যা (Theology or metaphysics) ৪২
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৪৩
চরিত্র দর্শন ৪৩
তালিমিয়া (শিয়া) সম্প্রদায় ৪৮
সুফিদের পথ ৬০
ফানাফিল্লাহ ৬৬
নবুয়তের তাৎপর্য ৬৮
আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান ৭৪
সন্দেহের কারণ ৭৬
আলেম সমাজের অবস্থা ৭৭
দর্শনের প্রতিক্রিয়া ৭৮
ইবনে সিনার অসিয়ত ৭৯
দুর্বল ঈমান ও এর অপকারিতা ৮২
নবুয়ত ও বুদ্ধি ৮৩
মনীষী ইমাম গাজ্জালী (র)-এর উপদেশ ৮৭
সুফিবাদ ৯৮
আনুগত্য ৯৮
নির্ভরতা ৯৮
নিষ্ঠা ৯৯
করণীয় ও বর্জনীয় ১০১

মহাত্মা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম

ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র ও জগদ্বিখ্যাত এই দার্শনিক, প্রকৃত আলেম ও সংসার বিরাগী পুরুষের নাম আবু হামেদ মুহাম্মদ। আর উপাধি হুজ্জাতুল ইসলাম বা ইসলামের প্রমাণ। তাঁর বংশগত উপাধি গাজ্জালী। খোরাসান প্রদেশের ভিতর তুস নামক একটি জেলার তাহরান শহরে ৪৫০ হিজরি সন মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রসিদ্ধ লোক না হলেও তাঁর দাদা ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তি। শৈশবকালেই তিনি পিতৃহারা হয়ে স্নেহময়ী জননীর ও শ্রদ্ধেয় দাদার তত্ত্বাবধানে বড় হন। আল্লামা সাহানী বলেন, গাজালাহ তুস জেলার একটি গ্রামের নাম। সেখানেই ইমাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে গাজ্জালী।

জন্মস্থান এবং তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

আল্লামা সামানী প্রমুখ কতিপয় ঐতিহাসিক– তুস নগরের উপকণ্ঠে 'গাজালী' নামক পল্লীকে ইমাম সাহেবের জন্মভূমি বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে তুস নগরের উপকণ্ঠে 'গাজালা নামে কোন পল্লী ছিল না; বরং তুস জিলার অন্তর্গত طاهران 'তাহেরান' নামক স্থানে ইমাম সাহেবের জন্ম হয়। ফলকথা, পারস্য দেশের তুস জেলার অন্তর্গত তাহেরান নামক শহরে হিজরি ৪৫০ সন মোতাবেক ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী ধূলির ধরায় জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগে মুসলমান সমাজে শিক্ষা-দীক্ষার বহুল প্রচার ছিল। কারণ, মহানবি হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের বাণী প্রচারের সাথে এও ঘোষণা করেছেন যে, "বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ।"

সে সময়ের মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ইসলামের মূল বাণী কলেমায়ে তওহিদকে যেমন শিরোধার্য করে নিয়েছেন, ঠিক সেরূপ গুরুত্ব সহকারে বিদ্যার্জনের প্রতিও তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইমাম গাজ্জালীর সময়ে পারস্য দেশ সল্‌জুক বংশীয়দের প্রভাবশালী সুলতান রুকনুদ্দিন তুঘলক বেগের শাসনাধীন ছিল। সল্‌জুক বংশীয় সুলতানগণ সম্বন্ধে মিস্টার লিয়েনপুল লিখেছেন, "সল্‌জুকী সুলতানগণের রাজত্বকাল মুসলমানদের প্রভূত উন্নতির সময় ছিল। এদের পূর্বে ইরান ছিল বূইয়া বংশীয় রাজাদের করায়াত্তে। তাঁরা ছিলেন শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের আমলে মুসলিম শক্তিগুলো একে অন্যের উপর আক্রমণ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সল্‌জুক বংশীয় তুর্কীরা ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁদের প্রাক্ ইসলামিক হিংস্র স্বভাব অনুপম সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়। ফলে তাঁরা মুসলিম জাহানের হারিয়ে যাওয়া শক্তি এবং প্রতিভাকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হন। সমগ্র এশিয়াসহ এক বিরাট অংশ এই বাদশাহ্‌র কবলে (শাসনে) আসে। এই শক্তির উত্থানের ফলে খ্রীষ্টিয় শক্তির অগ্রগতি রহিত হয়ে পরে।"

মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থানের যুগে মুসলমানের হৃদয়ে বিদ্যাশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র হয়েছিল যে, তাঁরা সে সময়ে প্রচলিত– ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও পারসিকদের জ্ঞান আহরণ সমাপ্ত করে প্রাচীন গ্রীক, রোমান, মিশরীয় এবং ভারতীয় জ্ঞান আহরণে প্রবৃত্ত হন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান, বিশ্বাস ও মতবাদের সমাবেশ হয়ে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়। ইমাম গাজ্জালীর পূর্ববর্তীকালে মুসলিম জগতে ইসলামী আকিদা ও জ্ঞানের সঙ্গে নানাবিধ মারাত্মক অমুসলমানী আকিদা ও জ্ঞান কালক্রমে এমনভাবে মিশে গেছে যে, মুসলামনী এবং অমুসলমানী আকিদার মধ্যে পার্থক্য করা মুসলমানদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজে এত অধিক পরিমাণে পার্থিব জ্ঞানের প্রসার হয়েছিল যে, সে সমস্তের চাপে ধর্মীয় বিদ্যার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সুতরাং এই অবস্থা হতে ধর্মীয় বিদ্যাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই হজরত ইমাম গাজ্জালী (র) "মিশকাতুল আনওয়ার"-সহ আরো বিভিন্ন জগদ্বিখ্যাত পুস্তকাদি রচনা করেন।

শৈশব কাল ও শিক্ষা ব্যবস্থা

সেকালে জ্ঞান অর্জনের মহা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ কারণে ইমাম সাহেবের পিতা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিলেন। আর এই দুঃখ জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি শেষ শয্যায় তাঁর একজন বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডেকে আনলেন এবং সামান্য অর্থ তাঁর হাতে প্রদান করে নিজের শিশুপুত্র দুটিকে (মুহাম্মদ ও আহমদ)-এর প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করলেন। সে মুহূর্তে তিনি তাঁর বন্ধুকে সম্বোধন করে অশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, "আমি বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত থেকে আজীবন দারুণ অনুতাপের আগুনে পুড়ে মরেছি। অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে আপনার নিকট আমার অনুরোধ, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই শিশু দুটোকে বিদ্যাশিক্ষার সুব্যবস্থা করবেন। এরা জ্ঞান লাভ করতে পারলে আমি আশা করতে পারি যে, তাদের জ্ঞান লাভের ওসিলায় আমার এই অনুতাপ সামান্য হলেও হ্রাস পেতে পারে।"

বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে, তিনি এমন শুভমুহূর্তেই আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দু'পুত্রকেই আল্লাহ তায়ালা বিশাল জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। যার কারণে বড় ছেলে মুহাম্মদ পরে ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী এবং কনিষ্ঠ আহমদ, ইমাম আহমদ গাজ্জালী নামে খ্যাতি লাভ করেন। এই যুগশ্রেষ্ঠ আলেম পুত্র দু'জনের পবিত্র জ্ঞানের ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের মরহুম পিতার বেসালের পর অভিভাবক যথাসময়ে তাদের দু'জনকে স্থানীয় মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে শিক্ষার জন্য ভর্তি করিয়ে দিলেন। তারা দু'জনেই শৈশব হতে অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁরা পূর্ণ কুরআন হেফজ করে কুরআনের হাফেজ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন এবং তৎপর আরবি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতা

ইমাম সাহেবের দরিদ্র পিতার বেসালের পূর্বমুহূর্তে তাঁর দু'পুত্রের শিক্ষা ও প্রতিপালনের জন্য বন্ধুর হাতে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে গিয়েছিলেন ইতোমধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। অভিভাবকের আর্থিক অবস্থাও দিন দিন

অসচ্ছলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছল। সুতরাং একদিন তিনি তাঁদের দু'জনকে পাশে বসিয়ে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বললেন, "বাবারা! তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য আমার হাতে যে সামান্য অর্থ প্রদান করেছিলেন, বর্তমানে তা নিঃশেষ হ য় গেল। আমার আর্থিক অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হতে চলল, আমার তত্ত্বাবধানে নিজ গৃহে রেখে তোমাদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা এখন আমার সাধ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার কাছে থাকলে আমি সঙ্কটের সম্মুখীন হব। তোমাদের বিদ্যা শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা হবে না। অতএব, তোমাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা এখন এটাই মনে করছি যে, তোমরা অন্যত্র কোথাও কোন সরকারি অবৈতনিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার চেষ্টা কর।" তাঁর উপদেশ মত তারা দু'ভাই শহরের এক অবৈতনিক মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

সে সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা

ইমাম সাহেবের সময়ে যদিও প্রধান প্রধান শহরে যথারীতি সরকারি অবৈতনিক মাদ্‌রাসার ব্যবস্থা ছিল এরপরও সমস্ত মসজিদে এবং বড় বড় ধর্মপ্রাণ লোকদের বসতবাড়িতেও বহু বে-সরকারি মাদ্‌রাসার ব্যবস্থাও চালু ছিল। বড় বড় জ্ঞানী ও বিদ্বানগণ সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করে এ সমস্ত মাদ্‌রাসায় বিনা বেতনে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত হতেন। প্রবীণ শিক্ষাবিদগণ খোদাপ্রাপ্তির লক্ষে সংসার-ধর্ম ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে নির্জন বাস অবলম্বন না করে কিংবা কর্ম-ক্ষমতা অভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক সমাজের ঘাড়ে বোঝা-স্বরূপ না হয়ে শিক্ষাদান কার্যে প্রবৃত্ত হতেন। বিদ্যালয়ের পার্শ্বস্থ ধনী প্রতিবেশি ও আমির-ওমরাহ্‌গণ উক্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক এবং দূর দেশীয় শিক্ষার্থীদের ভরণ-পোষণ এবং শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতেন। এ উপায়ে তৎকালে শিক্ষার পথ নিতান্ত সুগম ছিল। যে সমস্ত মসজিদে প্রধান প্রধান প্রবীণ ও উচ্চশিক্ষিত সুধীজন শিক্ষাদান করতেন, সে সমস্ত মসজিদ বা বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হতো। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিনা ব্যয়ে জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার পথও নিতান্ত সহজ ছিল।

গতিবদ্ধকতা হতে উত্তরণ

যা হোক, ইমাম সাহেব পল্লীর ক্ষুদ্র মক্তব ত্যাগপূর্বক সাধারণের সাহায্যে নিকটবর্তী শহরের প্রধান অবৈতনিক মাদ্‌রাসায় আরবি ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। যেমন ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অতুলনীয় মেধাশক্তি, তেমনি ভাগ্যক্রমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্ঞান-পিপাসা মিটানোর জন্য মহামনীষী আবু হামিদ আসফারায়িনী, আবু মুহাম্মদ জুবিনী প্রমুখের ন্যায় মহাজ্ঞানী শিক্ষকের সন্ধান মিলিয়ে দিলেন। তিনি প্রাণ ভরে তৃপ্তি সহকারে জ্ঞান-সুধা পান করতে লাগলেন। খ্যাতনামা ফিকাহ শাস্ত্রবিদ মহাত্মা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ রাযকানীর নিকট তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন।

ইমাম সাহেবের মাতৃভাষা ছিল ফার্সী। তিনি কুরআন মাজীদের হিফজ খতম করার পর মাতৃভাষা শিক্ষায় বৃথা সময় অপচয় না করে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। সে সময়ে সর্বজ্ঞানাধার আরবি ভাষার গ্রন্থসমূহ বাল্যকাল থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা ছিল। তাতে পাঠ্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের সাথে সাথে মাতৃভাষায়ও প্রভূত উন্নতি সাধন হতো।

মোটকথা, ইমাম সাহেব উক্ত শিক্ষার সুযোগ অন্বেষণে নিজ জন্মভূমি তাহেরান শহর হিজরত করে 'জুরজান' শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে তিনি মহাত্মা ইমাম আবু-নসর ইসমাঈলের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণ আরম্ভ করেন। বালকের তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মহাত্মা ইসম্‌মাঈল সাবে তাঁর পুত্রবৎ স্নেহে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রবীণ শিক্ষক উপযুক্ত শাগরেদ পেয়ে সর্বশক্তি নিয়োগে তাঁকে প্রকৃত শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হলেন। তৎকালে শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ ছিল যে, শিক্ষার্থীদের শুধু কিতাব বুঝিয়ে দিয়েই শিক্ষকগণ ক্ষান্ত হতেন না; বরং শিক্ষা প্রদানকালে যে ভাষায় পাঠের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন, শিক্ষার্থীদের তা হুবহু লিখে নিতে বাধ্য করতেন। এ পদ্ধতিতে লিখিত নোটগুলোতে تعليقات 'তা'লীকাত' বলা হতো। এ নোটগুলো সম্পূর্ণই শিক্ষক সাহেবকে শুনিয়ে প্রয়োজনবোধে সংশোধন করে নেওয়া হতো। অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে ইমাম সাহেব নিজ শিক্ষকের দেওয়া যাবতীয় পাঠের নোটগুলো সযত্নে রক্ষা করে বিরাট এক দফতর সঞ্চয় করেছিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা

জুরজান শহরের পাঠ সমাপনান্তে একদিন তিনি তাঁর পরিশ্রমলব্ধ নোটের বোঝা কাঁধে নিয়ে কাফেলাসহ জন্মভূমি তাহেরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে যাত্রীদল দস্যুদলের কবলে পতিত হন। দস্যুদল ইমাম সাহেবের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়। তাঁর যাবতীয় দ্রব্যের সাথে 'তালীকাত'-এর দফতরটিও দস্যু কর্তৃক লুণ্ঠন করে নেয়। তিনি নিজের অন্য কোন বস্তুর জন্য দুঃখিত না হয়ে কেবল নোটের দফতরটি হস্তচ্যুত হওয়ায় বিশেষ কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু ধৈর্যহারা হলেন না।

প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরণ

অনন্তর ইমাম সাহেব দস্যু সরদারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "সরদারজি! আমি একজন দরিদ্র শিক্ষার্থী। আপনার দল আমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছে। অন্য কোন বস্তুর জন্য আমি দুঃখিত নই। এর মধ্যে আমার ওস্তাদ সাহেব হতে সংগৃহীত কতকগুলো তালীকাত বা নোট আছে– তা আমার বড় পরিশ্রমলব্ধ বস্তু। এটি আমার নিকট থেকে খোয়া গেলে প্রবাসের এই দীর্ঘদিনের সকল কষ্টই বৃথা যাবে। দয়া করে আমার নোটগুলো আমাকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিন। আমার অর্জিত সমস্ত বিদ্যা ওর মধ্যেই সঞ্চিত রয়েছে।"

দস্যু-সর্দার বালকের কথা শ্রবণ করে সহাস্যে বললেন, "তুমি তো বেশ লেখাপড়া শিখেছ! অর্জিত বিদ্যা কাগজে সঞ্চিত রয়েছে, মনে কিছুই নাই, খুবতো পড়েছ!" ইত্যাকার হাস্যকৌতুকান্তে দলপতি ইমাম সাহেবের লুণ্ঠিত নোটের দফরতটি তাঁকে ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। দস্যু-সরদারের ব্যাঙ্গোক্তি তাঁর শিশু মনে এমন রেখাপাত করে যে, নিজের শিক্ষার উপর তাঁর ধিক্কার জন্মাল। ফলে তিনি তিন বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নোটের সম্পূর্ণ দফতরটি কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। সে থেকে দফতরের লিখিত যাবতীয় বিষয় তাঁর স্মরণপটে চিরতরে অঙ্কিত হয়ে গেল।

নিশাপুর নিজামিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

ইমাম সাহেব আবু নসর ইসমাঈলের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করে গাজ্জালী সাহেব জন্মভূমিতে ফিরে আসলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান-পিপাসা এত প্রবল হয়ে

উঠল যে, উচ্চশিক্ষা লাভ না করে তিনি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলেন না। সে সময়ে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুর শহরটি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই শহরেই সর্বপ্রথম আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এটি নিজামুল-মুলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে 'নিজামিয়া মাদ্‌রাসা' নামে খ্যাত প্রসিদ্ধ ছিল। সে সময় 'ইমামুল হারামাইন' উপাধিধারী জনৈক বিশ্ববরেণ্য অসাধারণ আলেম উক্ত মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষকরূপে শিক্ষা দান করতেন। এই মহাপুরুষ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা প্রদান ছাড়াও ধর্মীয় যাবতীয় বিভাগেরও প্রধান ছিলেন। ওয়াজ নসিহৎ, ইমামত, খতিব এবং সমস্ত মুসলিম রাজ্য কর্তৃক ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার তাঁরই উপর অর্পিত ছিল। সে সময়ের সমস্ত মুসলমান বাদশাহ এবং সুলতানগণের নিকট তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল। বাদশাহ ও সুলতানগণের ভুল মীমাংসাগুলোকে তিনি শুদ্ধ করে দিতেন। তাতে কেউ অসন্তুষ্ট হতেন না। তাঁর প্রতি জনসাধারণের ভক্তি এত প্রগাঢ় ছিল যে, বেয়াদবীর আশঙ্কায় কেউ তাঁর নাম মুখেও উচ্চারণ করত না। এ কারণে তাঁর প্রকৃত নাম অনেকেই বিস্মৃত হয়েছিল। কোন ঐতিহাসিক তাঁর প্রকৃত নাম আবুল মা'আলী কেউ-বা আবদুল মালিক বলে উল্লেখ করেছেন। 'নেহায়াতুত্তালাবা' 'শামিলে বারাহীন' এবং 'ইরশাদুল মুগিছীল খালক্ক' এই মহাজ্ঞানীর রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ মহাপুরুষ অতিশয় ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। ইমাম গাজ্জালী এই মহাপুরুষের শিক্ষাধীনে থেকে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানার্জনের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন।

শিক্ষকতা

বাগদাদে তৎকালীন তুর্কীরাজ মালেক শাহের আধিপত্য ছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিজামুল মুল্‌ক উপাধিধারী একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। এই মনীষীর প্রকৃত নাম ছিল হাসান ইবনে আলী। তিনিও ছিলেন ইমাম গাজ্জালীর জন্মভূমি তুস জেলার অন্তর্গত রাযকান গ্রামের অধিবাসী। ইনি শিক্ষার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে প্রথম এক সাধারণ সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। পরে নিজ কর্মদক্ষতা ও সততার গুণে বলখের শাসনকর্তার সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন, ক্রমে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও অসাধারণ কর্ম-নিষ্ঠার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে মালিক শাহের পিতা আল্‌ফ আসালান এই বিচক্ষণ মহাপুরুষকে স্বীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত

করেন। উজির নিজামুল মুল্‌ক নিজেও অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। তাঁর নামানুসারে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র 'মাদ্‌রাসায়ে নিজামিয়া'এবং এর পাঠ্যতালিকা 'দরসে নিজামী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই শিক্ষানুরাগী রাজপুরুষের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেই নিজামিয়া মাদ্‌রাসার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি ইমাম গাজ্জালীর অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলেন। এখন তাঁকে একেবারে হাতের নিকট পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। বাগদাদের বিশ্ববিশ্রুত নিজামিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কামনা ইমাম সাহেবের অন্তরে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। নিজামুল মুল্‌কের দরবারে উপনীত হয়ে তিনি নিজামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা পদের বাসনা জ্ঞাপন করলেন। নিজামুল মুলক এতে খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সেসময়ে কেউ রাজসভায় বিদ্বান সুধীমণ্ডলীর সাথে বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় ও বিতর্কে জয়লাভ করতে পারলেই নিজামিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক পদের উপযোগী বলে বিবেচিত হতেন। ইমাম সাহেব এরূপ কয়েকটি বিতর্কেই জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। এ সময় নিজামিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়।

অতএব, নিজামুল মুলক মহা আনন্দের সাথে ইমাম সাহেবকে ৪৮৪ হিজরিতে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বৎসর। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ পদে ইতপূর্বে কোন আলেম এত অল্প বয়সে নিযুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করতে সমর্থ হন নি। এমন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাঁর মান-মর্যাদা এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। এমনকি, স্বয়ং বাদশাহ এবং রাজপুরুষগণ রাজকার্যের জটিল সমস্যায় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সাল্‌জুকী নৃপতিগণের বাগদাদ দখলের পর এতে বাগদাদে দু' সিংহাসন অর্থাৎ দুটি বিভাগ স্থাপিত হয়। তুর্কীরাজ সাল্‌জুকীরা হলেন শাসন সংরক্ষণ বিভাগের কর্তা। আর নৈতিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি ধর্মীয় কার্যাবলির তত্ত্বাবধান ছিল আব্বাসীয় খলিফাগণের পরিচালনাধীন। ইমাম সাহেব এই উভয় বিভাগের কর্মকর্তাদের নজরেই অত্যন্ত সম্মানের পত্র

ছিলেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি স্বভাবত সম্মান ও মর্যাদাপ্রিয় ছিলেন। বিশিষ্ট আলেমগণের উচ্চস্তরের সম্মান ও মর্যাদা দর্শনেও তাঁর তৎপ্রতি বাসনা জন্মে। বাগদাদে নিজামিয়া মাদ্‌রাসার প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে তিনিও উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন।

রাজশক্তির উপর প্রভাব

এমন উচ্চপদে এত অল্প বয়সে নিযুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর নাম শীঘ্রই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি শাসন কর্তৃপক্ষও তখন সকল ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও ফতোয়া গ্রহণ করতেন এবং অনেক জটিল কাজে তাঁর পরামর্শকে তাঁরা অনেক মূল্যবান মনে করতেন। সালজুক বংশীয় সুলতানগণের ও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। সুলতানগণের হাতে ছিল শাসনভার এবং খলিফাদের হাতে ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শাসন ভার। সালজুক বংশীয় সুলতান মালিক শাহের ৪৮৫ হিজরি সনে বেসাল হলে দরবারের সভাসদগণ তাঁর চার বছর বয়স্ক পুত্র আহমদকে সিংহাসনে আরোহণ করালেন। তখন মুকতাদির বিল্লাহ বাগদাদের খলিফা নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নিকট আহমদের নামে খুত্‌বা পড়ার অনুমতি চাওয়া হলে তিনি তুর্কীদের ভয়ে ভীত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু খুত্‌বা একমাত্র বাগদাদের খলিফার নামেই পড়া হতো বলে তিনি অনুমতির সাথে সাথে ইমাম গাজ্জালী সাহেবকে তাঁর দূত হিসেবে তুর্কী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ফলে তিনি তুর্কীদের তাদের এই দাবি-দাওয়া ত্যাগ করালেন। তাতে ইমাম সাহেবের খ্যাতি আরো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল।

খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর মৃত্যুর পর খলিফা মুসতাজহার বিল্লাহ খলিফা হলে তিনি 'বাতেনী ফিরকা' নামে একটি দলকে অত্যন্ত শক্তিশালী দেখিয়ে ইমাম সাহেবকে তাদের মতের বিরুদ্ধে একটি কিতাব রচনার জন্য অনুরোধ করলেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি সেজন্য একটি কিতাব রচনা করে তার নাম অনুসারে এই কিতাবের নাম রাখলেন 'মুসতাজহারী'। তাঁরই রচিত কিতাব 'মুনকিজু মিনাদ্দালাল'-এ এই কথার উল্লেখ করেছেন।

ইমাম সাহেবের ওয়াজ নসিহত

ইমাম সাহেবের ওয়াজ মাহফিলে শত শত আলেম ও আমির-ওমরাহ হাজির থাকত। হজরতের ওয়াজ এতই যুক্তিপূর্ণ, দলিলভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গত ছিল যে, শেখ সায়িদ বিন ফারেজ মা'রুফ এবং ইবনে লুব্বান তার প্রত্যেকের ওয়াজ সাথে সাথেই লিখে রাখতেন। তার এ ধরনের ১৮৩টি ওয়াজ একত্রে সঞ্চয়ন করে ইমাম সাহেবকে দেখালেন তিনি তাতে কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্তন এনে তার নাম রাখলেন 'মাজালিসে গাজ্জালিয়া'।

তাসাউফ সাধনা ও নির্জনতা অবলম্বন

ইমাম সাহেবের সংসার বিরাগ জীবন যাপন নতুন ধরনের এক ইতিহাস। তাঁর রচিত কিতাব 'আল-মুনকিজু মিনাদ্দালাল'-এতে তিনি তাঁর কারণ বিষদভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সাহেব কিশোর বয়সে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তখন এই মাজহাবেরই শিক্ষা দীক্ষা তিনি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রাজধানী বাগদাদে আগমনের পর তিনি সমস্ত মাজহাবের লোককে সেখানে দেখতে পেয়ে তাদের বিভিন্ন মাজহাব অনুযায়ী তাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাদের সাথে আলোচনা দ্বারা তাদের মতামত জানতে লাগলেন। শিয়া, সুন্নী, মুতাজিলা, যিন্দিক, মাজুসী, ইসায়ী, কালামপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন দল তখন বাদগাদে উপস্থিত ছিল। তখন আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, দর্শন, মানতেক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান বিশ্বাস ও মতবাদের সমাবেশ হয়ে মুসলমান সমাজে বহু মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়। তারা পরস্পর পরস্পরের সাথে তর্কযুদ্ধ বা মোনাজেরায় লিপ্ত হতো। এতে ইমাম সাহেবের উপর এমন প্রভাব পড়ল যে তাঁর সমস্ত জীবনের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেল। ইমাম সাহেব বলেন, "প্রথম থেকেই প্রত্যেক জিনিসকে যাচাই করে দেখা আমার অভ্যাস ছিল। সেজন্য মাজহাবের উপর আমার অটল বিশ্বাস আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল, তা আস্তে আস্তে দূরে চলে যেতে লাগল। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে লাগলাম এবং ভাবলাম যে, এ প্রকারের অন্ধ বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রিষ্টানও তো করে থাকে। প্রকৃত বিদ্যার ভেতর কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকতে পারে না। যেমন এটা

ধ্রুবসত্য যে, দশ তিন হতে বেশি। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তিন দশ হতে বেশি এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে বলে আমি আমার লাঠিকে সাপে পরিণত করতে পারি। (সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে তা দেখিয়ে দেয়), তখন আমি বলব যে, এতে সন্দেহ নেই যে, লাঠিকে সাপে পরিণত করা বড় একটি কঠিন ব্যাপার কিন্তু তবুও তিন হতে দশ বেশি– এই বিশ্বাস মনে থেকেই যাবে। তখন আমি চিন্তা করতে লাগলাম, এ প্রকার বিশ্বাস কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পারে। জানলাম যে তা ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং প্রাথমিক জ্ঞান। যখন জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন ইন্দ্রিয়লবদ্ধ মতবাদের ভেতর আমার সন্দেহ হতে লাগল, এমনকি পরিশেষে কোন বিষয়ে আমার বিশ্বাস রইল না। এ অবস্থায় আমি দু'মাস অতিবাহিত করলাম। কিন্তু এরপর এ অবস্থা মন থেকে দূর হতে লাগল। তখনও নানান মাজহাব সম্বন্ধে যে সন্দেহ মনে উপস্থিত হয়েছিল, তা থেমে গেল। তখন ছিল চারটি প্রধান দল– কালামপন্থী, বাতেনী (তালিমী শিয়া), দার্শনিক ও সুফিদের দল। আমি এক একটি দলের মতামতের যাচাই ও অনুসন্ধান করতে লাগল। ইল্‌মে কালামের যত কিতাব ছিল, তা পড়লাম, কিন্তু তবুও মনে স্বস্তি পেলাম না। দর্শন শাস্ত্রের ভেতর যা বিশ্বাস করার বিষয় ছিল, তার সাথে মাজহাবের কোন সম্পর্ক নেই। যে অংশ মাজহাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলি, তা-ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নয়। যে দল সমসাময়িক ইমামের উপর অন্ধ বিশ্বাস করত, তাদের নাম 'বাতেনী বা শীয়া' দল। অতঃপর যখন সুফি সাধনায় মনোনিবেশ করলাম তখন দেখতে পেলাম একমাত্র সুফিগণই হক পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। এ সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র) সুফিবাদ সম্পর্কে বলেন, "সুদীর্ঘ দশ বছর কৃচ্ছ্র সাধনার মাধ্যমে আমি সন্দেহাতীত ভাবে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি যে, সুফিমণ্ডলীই আল্লাহর একনিষ্ঠ সাধক, আল্লাহর পথের যথার্থ পথিক, তাদের তরিকাই হলো সবচেয়ে নিখুঁত তরিকা, তাদের নৈতিক চরিত্র মানবকুল শ্রেষ্ঠ জীবনধারা অতি স্বচ্ছ এবং তারা নিখুঁত ও উন্নততর নৈতিকতার অধিকারী, তাদের নৈতিকতা ও চরিত্র এতই বলিষ্ঠ ও উচ্চমানের যে, সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও শরীয়তবেত্তাদের যাবতীয় জ্ঞান গরিমার সমন্বয় করেও এর মোকাবেলা করা যাবে না। অনুরূপ বলিষ্ঠ চরিত্র কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হবে না। কারণ

আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক নির্বিশেষে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ নূরে নবুয়তের দ্বারা স্নাত। এ নূরে নবুয়তকে বাদ দিলে আর কি আছে, যদ্বারা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?"

ফানাফিল্লাহ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর এতে সন্দেহ নেই। তবে তা কৃচ্ছ্রতা সাধনার পরিণতির দিক থেকে, অন্যথায় এটাই আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান, এর পূর্বে যা কিছু করা হয়, সবই এর প্রস্তুতি পর্বে গণ্য। ফানাফিল্লাহ থেকে দিব্যজ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে।

সুফিগণও এ সোপানে অনুপ্রবেশ করেই ধ্যানের (মুরাকাবা) মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবিদের আত্মার সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন, তাদের কথা শোনেন এবং তাঁদের সাহায্যে প্রকৃত জ্ঞান আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান। শুধু তাই নয়। তাঁদের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সৃষ্টি ও বস্তুজগতের উর্ধ্বে তাঁরা এমন একটি জগতের সন্ধান লাভ করেন যার অবস্থা ও প্রভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা বর্ণনার চেষ্টা করলে ত্রুটি বিচ্যুতি না হয়ে গত্যন্তর নেই। তাছাড়া সান্নিধ্য ও মিলনের বর্ণনাভঙ্গি বিশেষজ্ঞদের একান্ত নিজস্ব।

মোদ্দাকথা, যে ব্যক্তি তাসাউফের আলো পায় নি সে নবুয়তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মূর্খরাই সুফিবাদের বিবৃত তত্ত্ব ও তথ্যকে অস্বীকার করে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে।

হজরত ফারমাদীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ

স্বয়ং ইমাম গাজ্জালী (র) বলেন, "নির্জনবাস এবং রিয়াজতের নিয়ম আমি তাসাউফের কিতাবাদি থেকে শিখেছিলাম। কিন্তু যেহেতু কোন জ্ঞানই শুধু কিতাবপত্র থেকে পুরোপুরি অর্জিত হয় না; বরং সেজন্য কোন বিজ্ঞ শেখ তথা পীরের হাতে নিজেকে সমর্পণ (বাইয়াত) নিতে হয়।"

সমস্ত ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম সাহেব শেখ আবু আলী ফারমাদী (আফজাল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী)-এর হাতে বাইয়াত ছিলেন।

সন্তান ও মুরিদগণ

সংসার জীবনে দেখা যায় ইমাম সাহেবের কয়েকজন কন্যা ব্যতীত পুত্র সন্তান ছিল না। তন্মধ্যে শিওল মুনা নাম্মী একজন কন্যার নিম্নতম বংশধরের নাম শেখ মাজুদিন। ইমাম সাহেবের বহু সংখ্যক শাগরেদ ও মুরিদ ছিল। নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য– মুহাম্মদ বিন তাওমারত, আল্লামা আবু বকর আরাবি, কাজি আবু নসর আহমদ, ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল ফাত্হা আহাদ বিন আলী, আবুল মনসুর মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, আবু সাইদ মুহাম্মদ বিন আসয়াদ, আবু হামিদ, আবুল হাসান, আবু তালিব, আবদুল করিম প্রমুখ।

গ্রন্থ রচনায় ইমাম সাহেব

ইমাম সাহেব মাত্র ৫৪/৫৫ বছর জীবনকাল লাভ করেছিলেন। এরমধ্যে শৈশবকাল ও পাঠ্য জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৫৫ বছর যাবৎ তিনি পুস্তকাদি রচনার সময় পেয়েছিলেন। এ সমান্য সময়ের মধ্যে তিনি ছোট বড় প্রায় চারশত পুস্তক রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'ইয়াকুতুত্তাবীল' নামক তাফসীরুল কুরআন খানি ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। লিখার জন্য যে ৩৪/৫৫ বছর সময় পেয়েছিলেন এর সম্পূর্ণ সময়টুকু এ কাজে ব্যয় করার সুযোগ পান নি। কারণ, দশ এগার বছর তিনি দেশ পর্যটন ও নির্জনবাসে (সুফী সাধনায়) অতিবাহিত করেছেন। বাকি ২৪/২৫ বছর সময়ও একাধারে পুস্তক রচনায় অতিবাহিত করেন নি। বরং অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ইবাদতেও প্রতিদিন কিছু কিছু সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর দরবারে শিক্ষার্থী ও দীক্ষার্থীর সংখ্যা কোন দিনই কম ছিল না।

ইমাম সাহেবের দ্রুত কলম চালনা সম্বন্ধে আল্লামা নববী বলেছেন, "আমি ইমাম গাজ্জালীর হায়াতে জিন্দেগী ও তাঁর রচিত পুস্তকাদির পৃষ্ঠা হিসাব করে দেখলাম, তিনি প্রতিদিন গড়ে ১৬ পৃষ্ঠা লিখেছিলেন।"

ইমাম সাহেবের লিখিত কিতাবসমূহ

নিশাপুরে থাকাকালীন সময়েই ইমাম সাহেব মৌলিক গবেষণার সাথে পুস্তক রচনা শুরু করেন। ফলে অল্প দিনে তাঁর যশঃগৌরব চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জুরজান শহরে শিক্ষারত থাকাকালে তিনি ওস্তাদ-এর বাতলে দেওয়া পাঠ্য বিষয়ের নোট লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। যার ফলে সেখান থেকেই তাঁর গবেষণা ও রচনাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

ইতিহাসে দেখা যায়, নিশাপুরে অবস্থানকালেই তিনি জগদ্বিখ্যাত 'মনখুল' (চালুনী দ্বারা চালিত) নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কালক্রমে মুসলমানদের ধর্ম-বিশ্বাসে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি প্রবেশ করেছিল, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পর্যালোচনার মাধ্যমে সেগুলোকে বেছে আলাদা করা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা ইসলামের ধর্মীয় বিধান 'ফিকাহ্' শাস্ত্রের উপধারাসমূহে যে সমস্ত ভ্রম পূর্ণ ফালসাফা বা দার্শনিক মতবাদ প্রকাশ করেছিল, এ গ্রন্থের মধ্যে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম যুক্তিপূর্ণ বিচারে সেগুলোকে প্রকৃত ইসলামী ফালসাফার সাহায্যে বেছে পৃথক পৃথক করে ফেলা হয়। এছাড়াও তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন এবং কোন কোন কিতাবের বহু খণ্ডও আছে। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচিত কিতাবাদির ভেতর নিম্ন বর্ণিত গ্রন্থগুলো বিখ্যাত–

ফিকাহ শাস্ত্র ঃ ওয়াসীত, বাসিত, ওয়াজিজ, তালিকাতুন ফি খিয়ায়িল মাজহাব, বয়ানুল কাওলাইনে লিশ্যাফেয়ী, খুলাসাতুর রাসায়েল, গাইয়াতুল গাওর, ইখতিসারুল মুখতাসার, মাজমুয়াতুল ফতোয়া।

ফিকাহ উসুল ঃ তাহসীনুল মাখেজ, শিফাউল আলীল মুনতাখাল ফি এলমিল বাদায়ে, মনখুল মুসতাসফা, মুফাস্সালুল খিলাফ ফি ওসুলিল কিয়াস।

মানতিক ঃ মি'য়ইয়ারুল ইলম্, মাহাক্কুন নজর, মিজানুল আমল।

দর্শন ঃ মাকাসিদুল ফালাসাফাহ, আল মুনকিজু মিনাদ্দালাল।

কালাম ঃ তুহফাতুল ফালাসিফাহ, এলযামুল আওয়াম, ইকতিসাদ, মুসতাজহারী, ফাজাইহুল ইবাহিয়াহ হাকিকাতুর রূহ, কিসতাসুল মুসতাকীম, আল-জামিল ফি রদ্দে আলা মান গাইয়ারাল ইঞ্জিল, মাওয়াহিবুল বাতেনীয়াহ, তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামে ওয়া জানদাকাহ, রিসালাতুল কুদসিয়াহ।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ঃ এহ্ইয়াউল উলুমিদ্দীন, কিমিয়ায়ে সায়াদাত, আলমুকসাদাতুল আক্সা, আখলাকুল আবরার জাওয়াহেরুল কুরআন, জাওয়াহিরুল কুদ্স ফি হাকিকাতিন নফ্স, মিশকাতুল আবরার, মিনহাজুল আবেদীন, সিরাজুস সালেকীন, নসিহাতুল মুলুক, আইনাল ওলাদ, বেদাইয়াতুল হিদাইয়াহ, মিশকাতুল আনওয়ার ফি লাতায়িফিল আখাইয়ার।

তাফসীর ঃ 'ইয়াকুতুত্তাবীল' ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত।

ইমাম সাহেবের বহু অমূল্য গ্রন্থ দগ্ধীভূত

জগতের অধিকাংশ লোক ইমাম সাহেবের ভক্ত ও প্রশংসাকারী থাকলেও তাঁর শত্রু সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। এক শ্রেণির বিদ্বান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ ব্যক্তিরাই তাঁর শত্রু ছিল। এদের মধ্যকার কোন দুরাচার দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'মনখুল' গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফার কুৎসা সংযোজন করে তা ইমাম গাজ্জালীর নামে চালিয়ে দিয়ে খলিফার দরবারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আনে। ফলে 'মনখুল' কিতাবটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অকাট্য যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে খড়্গ প্রয়োগ করেছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাপিষ্ঠরা সে সমস্ত গ্রন্থের ভিন্নার্থ করে সর্বসাধারণকে ক্ষেপিয়ে সেই গ্রন্থগুলোও দগ্ধ করে ফেলেছে। এরূপে তাঁর বহু অমূল্য গ্রন্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় মনীষীগণ এরমধ্যে হতে কয়েকটি গ্রন্থ কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। আধুনিক সভ্যতার উপর সে সমস্ত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার যাবতীয় গ্রন্থ রক্ষিত হলে জগতের কি পরিমাণ উপকার সাধিত হতো তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন।

বেসাল মুহূর্ত

অবশেষে হিজরি ৫০৫ সালে ১৪ই জুমাদাছ্ছ ছানিয়া মুতাবেক ১৯ ডিসেম্বর ১১১১ খ্রিষ্টাব্দে রোজ সোমবার সকালে পঞ্চাশ বছর বয়সকালে ইমাম গাজ্জালী সাহেব স্বীয় বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন– ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তাঁর ভাই ইমাম আহমদ গাজ্জালী (র) ইমাম সাহেবের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠে স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস মতো উজু করে ফজরের সালাত আদায় করলেন। পূর্বে প্রস্তুতকৃত কাফনের কাপড়টি চেয়ে নিলেন এবং আপন চোখে স্পর্শ করে বললেন, "প্রভুর আদেশ শিরোধার্য', এ বাক্যটি মুখ থেকে নির্গত হওয়ার সাথে সাথে পদদ্বয় প্রসারিত করে দিলেন এবং সে মুহূর্তেই প্রাণ-স্রষ্টার হাতে স্বীয় প্রাণ সমর্পণ করলেন।"

ইমাম সাহেবের বেসালে সমগ্র ইসলামী জগৎ শোকাভিভূত হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কবি শোকগাথা রচনা করেন।

ভূমিকা

হে ভাই সকল! জ্ঞানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব এবং মাজহাব ও তার গভীরতম তাৎপর্য আপনারা আরো জানতে চান যে, এত সব দল ও মত এবং মতানৈক্য ও মতবিরোধ সত্ত্বেও আমি কিভাবে সত্যের সন্ধান পেলাম? এ পথে আমাকে কি কি বিপদাপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে? তাকলীদের বাধা পেরিয়ে আমি কিভাবে তত্ত্ব-সন্ধান ও দিব্য দৃষ্টির তুরীয় স্তরে দাখিল হলাম? এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কালাম শাস্ত্র থেকে আমি কি কি উপকার পেয়েছি। আর এ ব্যাপারে কি বলব যে, তত্ত্ব ও সত্যানুসন্ধান ও সাধু ইমামদের অন্ধ অনুকরণে নির্ভরশীল হওয়ার দরুন কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ তালিমিয়া সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমি কী শিক্ষা পেয়েছি? কী কারণে অনুসরণ করলাম এবং ধারাবাহিক অনুসন্ধান ও গবেষণার দরুন (এতদসংক্রান্ত) তত্ত্ব-নির্যাস ও সত্য-সার আখ্যা দেওয়া যায়, এমন কী জানলাম তার বিশদ আলোচনা এবং আমার সাহায্য পেতে উদগ্রীব, এমন বিদ্যার্থীদের প্রচুর ভিড় থাকা সত্ত্বেও আমি শিক্ষকতা হতে অবসর গ্রহণ করি, তারও কী বলব? এটাও কি আপনারা জানতে ইচ্ছা করেন যে এত সব কিছু করে এবং নির্জন ও নিভৃত অবস্থায় এত কাল অতিবাহিত করার পর পুনরায় নিশাপুর ফিরে এলাম কেন? আমি অনুভব করছি আপনারা এ সব শোনার জন্য একান্ত আগ্রহী, তাই বলছি এবং মহান আল্লাহর নিকট সামর্থ্য মাঙ্ছি, তিনিই আমার প্রতিপালক, তাঁরই উপর আমার ভরসা এবং তাঁরই নিকট আমার সকল চাওয়া-পাওয়া।

নানামুখী মতবাদ

তবে শুনুন। আদর্শ ও মতবাদের বৈপরীত্য আর ইমামদের মধ্যকার মত ও পথের বিভিন্নতা যা বিশ্ব মানবের ঐক্যসূত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে, তা যেন একটি অতল মহাসাগর। অনেকেই এ মহাসাগরে ডুব দিয়েছে। তবে সার্থক হয়েছে এমন ভাগ্যবানের সংখ্যা অতি নগণ্য। মজার ব্যাপার এই যে, তারা সবাই নিজেকে সার্থক ও সিদ্ধ বলে মনে করে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ বস্তুতে মতবাদে খুশি। (আল-কোরআন)

এসব মতবিরোধ ও মতান্তর সম্বন্ধে হজরত মুহাম্মদ ﷺ পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। হজরত ﷺ বলেন আমার উম্মতগণ তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে এক দলই শুধু মুক্তি পাবে। আল্লাহর সত্যনিষ্ঠ বান্দার বাণী ফলেছে। বস্তুতই তাঁর উম্মতগণ আজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের শিকারে পরিনত হয়েছে।

যৌবনের সূচনা হতেই আমি আলোচ্য মহাসাগরে নিমজ্জমান হতে অভ্যস্ত এবং পঞ্চাশ বছর বয়সে আজও আমার সে অভ্যাস যথাপূর্ব বহাল আছে। আমার এ অনুসন্ধান ও অনুশীলন কোন ভীতমনা ও দুর্বলপ্রাণ ব্যক্তির মতো ছিল না। তা ছিল এমন এক জন চিন্তাশীল ও পরিশ্রমী বাহাদুরের ন্যায় যিনি সত্যের সন্ধানে যে কোন বিপদাপদকে অতিক্রম করে লক্ষ্যমণি উদ্ধারার্থে দৃঢ় সংকল্প।

আমি প্রত্যেক দলের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে পরীক্ষা করেছি এবং প্রত্যেক মাজহাবের নিগূঢ় রহস্যবলি উপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছি, যেন সত্যাসত্যের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি সহজ হয় এবং জানা যায় কে সুন্নী মতবাদী আর বেদআতপন্থী। আমি না কোন আহলে বাতেনকে তাদের মতবাদের পরীক্ষা ব্যতীত ছেড়েছি, না কোন আহলে জাহেরকে তাদের মতবাদের গূঢ় অর্থ না জেনে ছেড়ে দিয়েছি। তদ্রূপ ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকদেরও আমি পরখ করে দেখেছি। তদ্রূপ ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকদেরও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। আমি যেমন পাশ্চাত্য দর্শনকে জানতে চেষ্টা করেছি তেমনি কালাম শাস্ত্রের

লক্ষ্য ও আলোচ্য এবং এতদ্‌সংক্রান্ত তাদের চেষ্টা ও সাধনার পরিধি বুঝতে চেষ্টা করেছি। সুফি-দরবেশদেরও আমি পরখ করেছি। তাদের ন্যায়পরায়নতা এবং সাবধানতার সীমা এবং ইবাদতের ফলাফল জানার চেষ্টা করেছি। তদ্রূপ যিন্দিক ও ব্রহ্মচারীকেও আমি পরখ করেছি। তাদের আদর্শহীনতা ও কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান ও অনুধাবন ছিল আমার গবেষণার প্রধান লক্ষ্য।

এ সব বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা এবং প্রকৃত সত্য উপলব্ধির উদ্দীপনা আমার সহজাত বৈশিষ্ট ছিল। আয়াস ও প্রয়াস লব্ধ নয় বরং আমার বৃত্তি ও ফিতরাতই হচ্ছে এই যে আমি যা কিছু বলব বুঝে-সুঝে বলব। ফলে যৌবনের শুরুতে তাকলিদের প্রতি আমার আস্থা হারিয়ে যায় এবং গতানুগতিক ধর্ম বিশ্বসের প্রতি আমার কোন মোহই ছিল না। আমি গভীর ভাবে লক্ষ করেছি যে বর্তমানে অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে এগুলো গ্রহণ ও বর্জন হয় না। গতানুগতিক ভাবেই ইহুদীর সন্তাগন ইহুদী মতবাদ গ্রহণ করে আর খ্রিষ্টান সন্তানরা ভালোবাসে খ্রিষ্ট ধর্মকে আর মুসলমানদের সন্তানগণ গড়ে উঠে ইসলামী ভাবধারায়। হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেনঃ সকল শিশুই প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মাতা-পিতা তাদের ইহুদী খ্রিষ্টান ও অগ্নি উপাসক বানিয়ে ফেলে।

এ হাদীস জানার পর থেকেই আসল ফিতরাত বা প্রকৃতি কি আমার অন্তরে এটা উপলব্ধির প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে। এর পর আমি শিশুদের প্রকৃতি ও মাতা পিতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মুরব্বীদের অহেতুক অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট উপলব্ধির চেষ্টা করি। আমার আন্তরিক প্রেরণা ছিল যে, যাবতীয় বস্তুর তত্ত্ব-জ্ঞান আমাকে লাভ করতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে, আকায়েদ ও মতবাদের এ গোলক ধাঁধার মধ্যে কোন সত্য রয়েছে কি নেই, বা কত পরিমাণ আছে। কিন্তু তার পূর্বে মূল জ্ঞান সত্তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা থাকা চাই।

জ্ঞানের সংজ্ঞা

অতঃপর আসল জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আমি অনেক চেষ্টা সাধনা করেছি। ফলে যা বুঝেছি তা এই যে জ্ঞানের আলোকে সকল বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং কোনরূপ ভুল ভ্রান্তির অবকাশ থাকে না তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান এবং যে জ্ঞানের দ্বারা এমন একটি দৃঢ় বিশ্বাস ও মনোবল সৃষ্টি হয় যা পথভ্রষ্টতার সকল আশঙ্কা হতে মুক্ত, তা-ই হলো যথার্থ জ্ঞান। উদাহরণ স্বরূপ প্রস্তরখণ্ডকে স্বচ্ছ স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তর করতে সক্ষম এবং লাঠি দ্বারা সাপ তৈরি করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি যদি সে বিশ্বাসকে আন্দোলিত করার প্রয়াস পায় তথাপি তা অচল এবং অটল থাকবে। যেমন আমি জানি, দশ তিনের অধিক। জনৈক ব্যক্তি এসে প্রতিবাদ করে বলল, না তিন দশের অধিক। এর প্রমাণস্বরূপ সে একটা রড দ্বারা একটি সাপ বানিয়ে দেখালো। আমি তার এ অলৌকিক শক্তি স্বচক্ষে দেখলাম। কিন্তু তার এ শক্তি আমাকে স্বম্ভিত করলেও আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে মোটেও বিচলিত করতে সক্ষম হবে না এবং বিশ্বাস আমার অচল অটল থাকবে যে, দশ তিনের অধিক।

অতঃপর আমি নিশ্চিত হব যে, যে-জ্ঞান উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত নয়, তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ যে জ্ঞান স্বয়ং দ্বিধা সন্দেহ ও ভুল-ভ্রান্তির অবকাশমুক্ত নয়, তা হতে কোন বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জন হয় না। আর উক্ত শক্তিও তার নেই।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান

প্রকৃত জ্ঞান ও তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উক্ত ধারণা লাভের পর তার আলোকে আমি নিজের জ্ঞানকে পরীক্ষা করলাম। মনে হলো আমার অনুরূপ আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। ইন্দ্রিয়ের প্রতি আস্থশীল হলাম। ভাবলাম এদের সাহায্যে আমার সমস্যার সমাধানের প্রয়াস পাব। তবে ব্যাপারটি ভালভাবে পরখ করে নেওয়া দরকার। নতুবা আবার ভুলের শিকার হতে পারি। ইতঃপূর্বে আমি বিশ্বাস করতাম তাকলিদই পরম সত্য লাভের চরম পন্থা। তাতে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তির অবকাশ নেই। বর্তমানে আমার এ বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ চিন্তা মনে জাগামাত্র আমি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করি। খুব ভাল করে খতিয়ে দেখলাম, এগুলোকে সন্দেহ করার বা নির্ভযোগ্য বলে স্বীকার না করার সুযোগ আছে কিনা? এই গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আমার মনে হলো যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোও সংশয় ও সন্দেহের বাইরে নয়। পরিণামে এ সন্দেহ বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় কি নির্ভরযোগ্য? একথা সত্য যে ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে দৃষ্টি বা দর্শনেন্দ্রির তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। এর অবস্থা কী? যেমন একটি ছায়া, দৃশ্যত তাতে কোন নড়াচড়া বা স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয় না। এ ব্যাপারে দর্শনেন্দ্রিয়ের ফলাফল আসে যে, ছায়াটি অবিরত স্পন্দনশীল, এ স্পন্দন আকস্মিক নয়, ক্রমাগত ও অনির্ণেয়। তদ্রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের নির্ণয়ে একটি তারকা একটি স্বর্ণমুদ্রা থেকে বড় হবে না। তবে গাণিতিক প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, এটা গোটা ভূ-ভাগ অপেক্ষা অনেক বড়। ফলে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে এবং এর কোন সিদ্ধান্ত অকাট্য বলে স্বীকার করতে পারলাম না। তবে সমস্যার সামাধান কোথায়? এ অনিশ্চয়তার প্রতীকার কী? এ ধরনের বহু প্রশ্ন এসে মনে দোলা দিতে লাগল।

এ সব প্রশ্নের জবাবে অনেক ভেবেছি। স্বপ্নালৌকিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবস্থা আমাকে এ ব্যাপারে অনেক সাহায্যে করেছে। আমার সংশয় ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাপ্নিক উপলব্ধি হতে মনে একটা নতুন চিন্তা জাগল। তা হলো এই যে, আমরা স্বপ্নে বহু রকম বস্তু ও অবস্থা অবলোকন করি।

স্বপ্নাবস্থায় এগুলোকে অমরা বাস্তব ও স্থায়ী বলে মনে করি। স্বপ্ন ভঙ্গ হলে বুঝা যায় সবই কল্পনা ও অমূলক ধারণার কারসাজি। এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এমতাবস্থায় এর কি নিশ্চয়তা আছে যে, জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা বা হেতুভিত্তিক অবধারণাগুলো সবই যথার্থ ও সত্য? হতে পারে আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো সঠিক। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তুলনায় নিদ্রিত অবস্থা যা অনুরূপ অপর একটি অবস্থা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে প্রভাবিত করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। অতএব লক্ষ্যিত অবস্থায় বিচারে আমাদের অনিদ্রা ও নিদ্রার অন্তর্ভুক্ত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি চিন্তা করি তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত ও নিছক যুক্তিভিত্তিক অবধারণাগুলো অকাট্যতার দাবি বাতুলতা ও অমূলক ধারণা ব্যতীত কিছু নয়। সুফিগণ যে এক বিশেষ ধরনের অবস্থা নিয়ে আলোচনা গবেষণা করেন হয়ত তা অনেকটা এ ধরনেরই হবে। তাঁরা দাবি করেন যে, যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে স্বাধীন হয়ে তারা যখন আধ্যাত্মিক ভুবনে বিচরণ করতে থাকেন তখন অতি প্রকৃতের বা অলৌকিকের অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের অন্তর এমন রহস্যপূর্ণ সচেতনতা ও উপলব্ধির উন্মেষ হয়, শুধু বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যায় উপলব্ধি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মৃতাবস্থায় সাথেও এর তুলনা করা যেতে পারে। হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, ইহলোকে সকল মানুষ ঘুমের ঘোরে রয়েছে– জাগবে যখন মৃত্যু হবে।

আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমাদের পার্থিব জীবন পরকাল অপেক্ষা যেন নিদ্রাই বটে। মৃত্যুর পর যখন মানুষের দৃষ্টি উন্মোচিত হবে তখন তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, ইহলৌকিক বিবেচনায় যা তারা দেখেছিল বা ভেবেছিল তা সবই অবাস্তব। আমি তোমাদের থেকে আবরন তুলে দিলাম, কাজেই আজ তোমাদের দৃষ্টি প্রখর। (আল-কোরআন)

এমনি করে আমার দুশ্চিন্তা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠে আর মনে সন্দেহ দ্বিধা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে আমি এর সুষ্ঠু প্রতিকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। আমার চেষ্টা কাজে আসে নি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদির সাহায্যে কেবল এর প্রতিকার সম্ভব ছিল। শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা তথা যাবতীয় প্রমাণাদি আমার আস্থা হারাল। তবে এ সন্দিগ্ধতা ছিল আমার একটা মানসিক অবস্থা ও অন্তরস্থিত অস্থিরতা। বচন ও বক্তব্যে তা প্রকাশ পায় নি।

নির্ভরযোগ্য জ্ঞান

অবশেষে আল্লাহ আমার প্রতি প্রসন্ন হলেন এবং এ মানসিক ব্যাধি হতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করলেন। আমার মন প্রকৃতিস্থ হলো। বুদ্ধিবৃত্তি তার লুপ্ত আস্থা ফিরে পেল। তবে যুক্তি প্রমাণের চিরাচরিত নিয়মের মাধ্যমে তা হয় নি। আল্লাহ আমার অন্তরে একবিশেষ প্রকারের নূর জ্বেলে দেন।

এর সাহায্যে আমার অন্তর থেকে সংশয় ও সন্দেহের যাবতীয় অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়। বস্তুত এ নূর দ্বারাই অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞান ও রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। যারা মনে করেন, যে, শুধু যুক্তি প্রমাণের দ্বারা অনুরূপ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব তারা আল্লাহের অসীম অনুগ্রহকে সংকীর্ণ ও সীমিত করেছেন মাত্র। নিম্নের হাদীস থেকেও এ নূরের সমর্থন দেখা যায়। একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেন, ইসলামের জন্য তার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দনে এর মর্ম কী? হজরত হজরত মুহাম্মদ ﷺ জবাব দেন, এ একটি নূর যা আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে উদয় করেন। প্রশ্ন করা হলো, মানুষ কি করে নূরকে উপলব্ধি করবে? নবি ﷺ উত্তর দিলেন এ প্রতারণাময় জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্থায়ী পরকালের প্রতি মনোনিবেশ দ্বারা। নীচের হাদীসটিও সে একই অর্থ বহন করে। আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টিকে প্রথম অন্ধকারে সৃজন করেন, অতঃপর তিনি তাদের উপর নূর বিকিরণ করে দেন।

প্রকৃত সত্যসন্ধানীর উচিৎ মুক্তি প্রমাণ সর্বস্ব না হয়ে আলোচ্য নূরের আলোকে আত্মজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। আল্লাহর দান ও করুণার সাগরে মাঝে মধ্যে তরঙ্গ উঠে। তখন এ থেকে নূর বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তাই হজরত রাসূল ﷺ আমাদের সে সকল সময়ের সন্ধানে থাকার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন মুহূর্তগুলোর মাঝে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অনেক দান রয়েছে, তোমরা তার সন্ধানে থাক।

এ আলোচনাটিকে ইচ্ছা করেই দীর্ঘ করেছি। উদ্দেশ্য তোমাদের সাধনা ও সন্ধান যেন তুরীয়স্তরে পৌঁছে এবং তোমাদের মনে সাধারণ চেষ্টা সাধনার অতীত তত্ত্বাবলির অনুসন্ধিৎসা জাগে। কেননা সাধারণ সাধনাসিদ্ধ বিষয় অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে না। এ আমাদের মনের মাঝে সদা বর্তমান রয়েছে। যতই এর অনুসন্ধান করা যাকে ততই স্পষ্ট মনে হবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত একটি বিষয়ই অনুসন্ধানের জন্য বাকি থাকে। তা হলো যা চেষ্টা সাধনার সাধারণ সীমার অতীত। এ স্তরের অনুসন্ধানের একটি অতিরিক্ত উপকারিতা রয়েছে। তা হলো এই যে, যে ব্যক্তি এত উচ্চ স্তরের অনুসন্ধানে অভ্যস্ত, সাধারন সাধনাসিদ্ধ ব্যাপারে তার শৈথিল্য রয়েছে তাকে এ অপবাদ দেওয়া যায় না।

সত্যানুসন্ধানীর প্রকারভেদ

আল্লাহর অপার করুণা। আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কেটে গেল। আমি দ্বিধা সংশয়ের শৃঙ্খল হতে মুক্তি পেলাম। আমি সত্যানুসন্ধানীদের প্রধানত চার ভাগে ভাগ করলাম। তাঁরা হলেন:

১. ধর্মবেত্তা,

২. বাতেনিয়া (শিয়া),

৩. দার্শনিক এবং

৪. সুফি।

আমি এক এক করে এখানে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ধর্মবেত্তাগন, নিজেদের ধর্মের মৌলনীতিবিদ ও অনাগত ভবিষ্যতদ্রষ্টা বলে ভেবে থাকেন।

বাতেনিয়া সম্প্রদায়, তথাকথিত তালিমীয়াদেরই দলভুক্ত। তাদের বিশ্বাস যে, শুধু সাধু অনুকরণের মাধ্যমেই নূর ও আধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। তাদের ধারণা অনুযায়ী সত্য লাভের এক মাত্র উপায় হলো তালিম।

দার্শনিকগণ, সম্পূর্ণ যুক্তি তর্কের প্রতি নির্ভরশীল।

সুফিগণ, নিজেদের আল্লাহর নিকটতম বলে দাবি করেন এবং ভেবে থাকেন যে, তাঁরা যথার্থ জ্ঞান ও আধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী।

এ দল চতুষ্টয়ের যাচাই-বাছাইয়ের পর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, সত্য এদের কাছে পাওয়া যাবে এবং সত্যের সাধকদের আসল স্বরূপও তাদের নিকট জানা যাবে। এ ছাড়া আর কোথাও তা আশা করা যায় না। অতএব আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে সত্য এদের কাছেই পাওয়া যাবে। আপাতত এছাড়া আমার গত্যন্তরই বা কোথায় একদিন যে তাকলিদ ছিল আমার আত্মা প্রশান্তি, আজ অমি তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত এবং তা পুনর্গ্রহণের কোন সম্ভাবনাও নেই।

এতদসত্ত্বেও অজ্ঞাতভাবে অনুকরণ হতে পারে। অবশ্য তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। আমাদের কোন সিদ্ধান্তের সাথে তাকলিদ এর কোন অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে জানতে পারলেই তা পরিত্যক্ত হবে। যখন আমি এ সূক্ষ্ম যোগসূত্রের সন্ধান পাব এবং জানতে পারব যে, আমি মুকাল্লিদ তখনই উক্ত তাকলিদভিত্তিক আকায়েদের নাজুক কাঁচপাত্রটি এমনি চূর্ণ বিচূর্ণ ও পুনর্গঠিত সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নেই যে এ দল চতুষ্টয়ের আকায়েদকে যাচাই বাছাই করা অপরিহার্য এবং তাদেরই প্রদর্শিত পথে কিছুদূর এগিয়ে বাস্তব মূল্যায়নের মাধ্যমে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা আবশ্যক যে, এদের মধ্যে গ্রহণীয় কিছু রয়েছে কিনা? এখন আমি এতদ্‌সংক্রান্ত আমার অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ সার বস্তুগুলো ধারাক্রমিকভাবে এখানে আলোচনা করছি। আলোচনা আরম্ভ হবে কালাম শাস্ত্র থেকে এবং সমাপ্ত হবে সুফিবাদে, আর মাঝখানে আলোচনা হবে দর্শনও তালিমিয়াদের দলভুক্ত বাতেনিয়াদের মতবাদ।

কালাম শাস্ত্র

প্রথমে আমি কালাম শাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণায় মগ্ন হই। আমি আলোচ্য বিষয়বেত্তাদের রচিত গ্রন্থবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করি এবং এর লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট অবগত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করি। অধিকন্তু আমি এর বিশদ আলোচনা ও খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছি। বিষয়টি সম্পর্কে আমার পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বিষয়বেত্তাদের কামনাবাসনা পূরণ হলেও আমার সন্দেহ ও সংশয় ব্যাধির মুক্তির ব্যাপারে এ আদৌ ফলদায়ক হয় নি। কালাম বেদআতপন্থীদের অনুসৃত বিভ্রান্তির ধূম্রজাল হতে সুন্নী মতাবলম্বীদের রক্ষা করাই হলো এর লক্ষ্য। বিষয়টির অনুবর্তনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে। আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাধ্যমে স্বীয় সৃষ্টিকে শাশ্বত ও খাঁটি ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা দান করেন। এতে ইহকাল পরকাল উভয়ের কল্যাণ সম্পৃক্ত রয়েছে। কুরআন ও হাদীস শাস্ত্রের এ দাবির স্বপক্ষে প্রচুর প্রমাণ ও সমর্থন রয়েছে। পরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে এর সাথে সুন্নীদের পূর্বাপর কোনই সম্পর্ক নেই। শয়তানের ভক্তরা ভীষণভাবে এর প্রচার শুরু হয়। আশঙ্কা হচ্ছিল যে সুন্নীদের সরল বিশ্বাসের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। এমন মুহূর্তে আল্লাহ তাদের প্রতিহত করার জন্য কালামবিদদের সৃষ্টি করেন এবং উদ্দীপ্তি করেন তাদের অন্তরে দীনের সাহায্য ও ইসলামের সহায়তা করার ইচ্ছে। বলিষ্ঠ যোগ্যতা এবং পরম তাদের যুক্তি প্রমাণের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ভালোভাবে দেখিয়ে দেন এবং বেদআত ও হজরত ﷺ প্রদর্শিত পথের মধ্যকার পার্থক্য বুঝিয়ে দেন। অনুরূপ আত্মরক্ষামূলক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়েই কালাম শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়। মূলত এদের অনেকেই এ উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়েছেন, অর্থাৎ রসূল ﷺ এর আদর্শকে বেদাতের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এরা মরণপন সংগ্রাম করে প্রত্যাদেশলবদ্ধ আকায়েদ ও চিন্তাধারাকে নির্ভেজাল ও যথাস্থ রেখেছেন এবং বেদআতপন্থীদের যাবতীয় অভিযোগ ও প্রতিবাদের যথাযোগ্য জবাব দিয়েছেন।

এ সাফাল্য সত্ত্বেও তাদের প্রমাণ পদ্ধতি ও তর্কনীতিতে একটি ভ্রান্তি ছিল। তা এই যে, প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রমাণাদিই এরা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করতেন। এ বাপারে তাঁদের প্রধান নীতি হলো এই যে, নিজেদের কাছে যথার্থ বলে বিবেচিত এবং নিজেরা খণ্ডন করতে অক্ষম এ ধরনের যুক্তিই তাঁরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমধিক পরিমাণে ব্যবহার করতেন। কারণ তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুকাল্লিদ। তাঁরা প্রয়োজন হলেও ইজমাকে অতিক্রম করতে রাজি ছিলেন না এবং কুরআনের ব্যাখ্যা পরম্পরায় প্রাপ্ত ও স্বমতে সত্য বলে বিবেচিত ছোটখাট বিষয়গুলো গ্রহণের ব্যাপারেও তাঁরা প্রচণ্ড গোঁড়া ছিলেন। যা হোক, স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব্যতীত স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণ পদ্ধতি মোটেই ফলদায়ক নয়। বিশেষ করে এতদ্বারা আমার মরম-ব্যাধির কোন উপশম সম্ভব নয়। কারণ এতে কোন বিষয়েরই মৌল-উপাদান বা তত্ত্বগত আলোচনা নেই। তবে এটা ঠিক যে, এর অনুবর্তনের প্রথম পর্যায়ে তর্ক বিতর্কচ্ছলে তাতে তত্ত্বস্পর্শী আলোচনাও হতো। যেমন সময়ে সময়ে তাঁরা বস্তুর অব্যয় উপাদান ও আপতিত গুণাবলি সম্পর্কে ও সামান্য আলোচনা করেছেন। তবে এ গুলো তাঁদের মৌলিক আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত ছিল বিধায় আলোচনা সারগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয় নি। এর অনিবার্য পরিণতি হয়েছিল এই যে মানসিক চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা নিরসনে সমর্থ এবং খাঁটি সত্য ও তত্ত্বের সন্ধান দানে সক্ষম, এমন কোন উপদান তাঁদের গ্রন্থগুলোতে খুবই কম ছিল। এ থেকে আমার মতো কারো কোন উপকার হয় নি, এমন কথা আমি বলি না। তবে, এতে তাকলিদের প্রভাব ছিল না বা মৌলিকত্ব ছিল, এটাও বলা সম্ভব নয়। এখানে কেবল নিজের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। যারা এথেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে বা ঈমানরূপ সম্পদের অধিকারী হয়েছে তাঁদের নিয়ে উপহাস করা আমার লক্ষ্য নয়। কারণ রোগের বিভিন্নতায় ওষুধেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। আবার এমনও তো দেখা যায় যে ওষুধ সেবন করে একজন রোগমুক্ত হয়েছে, ঠিক তা-ই সেবন করে অন্য জন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

দর্শন শাস্ত্র

দর্শন মূলত কী? এতে বর্জনীয় অংশের পরিমাণ কত? তার অনুসারীদর নাস্তিক বলার কারণ কী? এতে তাদের নিজস্ব অবদান কী? আর কোন কোন স্থানে তারা অনুকরণ সর্বস্ব এবং কী তার নিরূপণের সঠিক উপায়?

কালাম শাস্ত্রের গবেষণা শেষ করে আমি দর্শনের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচানায় পরিপ্রে ক্ষিতে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, কোন বিষয়ের সমালোচনার অধিকার পেতে হলে প্রথমে তাকে সে বিষয়ের মূল লক্ষ্য ও প্রকৃত তাৎপর্যের যথার্থ সন্ধান লাভ করতে হবে। নতুবা সে বিষয়ের আলোচনা সমালোচনার কথা যে ব্যক্তি তার আলোচ্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত সমকক্ষ নয় বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উত্থান পতনের ইতিহাস সম্পর্কে ততোধিক অবহিত নয়, তার পক্ষে সে বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ সামালোচনা করা সম্ভব নয়। পরিমাপের বিষয় যে কোন, মুসলিম সুধীজনই বিষয়টি উপলব্ধির জন্য তেমন যত্ন নেন নি কাজেই আলোচনাক্রমে বা প্রতিপক্ষের জবাবে কালামবিদগণ নিজ নিজ গ্রন্থাবলিতে দর্শন শাস্ত্রে সম্পর্কে যা কিছ আলোচনা করেছেন তা সবই ত্রুটিযুক্ত ও স্ববিরোধী। তদ্বারা আমার ন্যায় দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নিগূঢ়তর তাৎপর্যকোঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ একজন জ্ঞানীর অনুপ্রাণিত হওয়া দূরের কথা, একটি সাধারণ মূর্খ লোকেও তাতে আকষ্ট হবে না।

সুতরাং আমি ভাল করে উপলব্ধি করে নিয়েছি যে, না জেনে না বুঝে কোন মতবাদের সমালোচনা করা অন্ধকারে বাণ নিক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমি দর্শন-তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্যোদ্ঘাটনের প্রয়াস পাই। আমি বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের রচিত স্বাধীন ভাবে আমি সেগুলোর পর্যালোচনা করি। বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়েই আমাকে তা করতে হয়েছে।

কেননা বাগদাদের প্রায় তিনশত বিদ্যার্থী অনবরতই আমার কাছে আসত। গ্রন্থ রচনাই ছিল আমার প্রধান কাজ। এ অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে দু'

বছর অবধি আমি দর্শন শাস্ত্রের অনুচর্চা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আল্লাহর অশেষ রহমত এরই মধ্যে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পাই। আমি আলোচ্য বিষয়ের গ্রন্থগুলো পাঠ করেই ক্ষান্ত হই নি। এর নানা সমস্যা নিয়ে রীতিমত চিন্তা-ভাবনা করেছি। শুধু তাই নয়। এর গূঢ় মর্ম এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে নিয়মিত সমালোচনাও করেছি। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি এর মধ্যে কতটুকু সত্য আর কত-অংশ ভ্রান্ত। এভাবে গভীর গবেষণা ও অনু-সন্ধানের ফলে দার্শনিকদের সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত আমি অবগত হলাম তা এই-আমার মতে দার্শনিকগণ বহু ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত আর তাঁদের দর্শন ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী। তবে দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা থাকলেও নাস্তিকতা ও অধর্ম হতে কেউই সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তবে প্রাচীন ও আধুনিক এবং আদি ও শেষ প্রভৃতি যুগ বিশেষ তাদের মাঝে নাস্তিক্য ও অধর্মের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণের তারতম্য দেখা যায়।

দার্শনিকদের বিভিন্ন দল

দার্শনিকগণ নানা দলে বিভক্ত ও চিন্তাধারায় বিভিন্ন হলেও মোটামুটি তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বস্তুবাদী;

২. প্রতিবাদী ও

৩. অস্তিবাদী।

বস্তুবাদীগণ প্রাচীন ধর্মহীন দার্শনিকদের অন্তর্ভুক্ত। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টার ও ঐ নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর অস্তিত্বে এদের বিশ্বাস নেই। তাদের মতে বিশ্বের কোন স্রষ্টা নেই এবং এ প্রাণী থেকে তা সৃষ্টি। অনুনিয়মে সৃষ্টির এ ধারা অনাদিকাল থেকেই আছে এবং অনন্তকাল থাকবে। উক্ত মতবাদীগণ নাস্তিক।

প্রকৃতিবিদগণ, প্রকৃতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্রময় রহস্য উন্মোচনে আত্মনিবিষ্ট। অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সাহায্যে জীব জগতের যথার্থ অবয়ব বিশ্লেষণের সাহায্যে আল্লাহর আশ্চর্য সৃষ্টি নৈপুণ্য ও নিবিড় রহস্য সম্পর্কে এদের এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং এ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাধ্য হয়েই তারা মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তিনিই যাবতীয় সৃষ্টির আদি-অন্ত ও ধর্ম কর্ম বা স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। যে ব্যক্তি সৃষ্টি অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার চর্চা করবে এবং এর কাঠামের নিপুণতা সম্পর্কে গবেষণা করবে সে এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, পরম সত্তা এ বিশ্বজগৎ, বিশেষ করে মানবমণ্ডলীর স্রষ্টা, তিনি সর্বজ্ঞ আর বিশ্বজগৎ তাঁরই পূর্ণ ব্যবস্থাধীনে নিয়ন্ত্রিত।

এভাবে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা চর্চার মাধ্যমে পরম সত্তার সন্ধান লাভে কৃতকার্য হলেও তারা আত্মার যথার্থ পরিচয় পায় নি। এ কারণে যে, তাদের অনুসন্ধান ও গবেষণা, অবয়ব ও এর সাংগঠনিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের ধারণা মানব প্রকৃতির সৃষ্টি ও গঠনে এর অবয়ব, সংস্থাপন ও সৌষ্ঠবের যথেষ্ঠ প্রভাব রয়েছে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকৃতি যেহেতু এ অবয়ব

প্রকৃতির অধীনে ফলে এ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির প্রলয়ের সাথে সাথে এ থেকে তার প্রকৃতি ও আত্মার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। মোদ্দাকথা, তারা আত্মার অবিনশ্বরত্বকে স্বীকার করে না। এমনিভাবে তারা পরকাল ও এর প্রাসঙ্গিক সকল অবস্থা বা অনুষ্ঠানাদি যথা পুনুরুত্থান এবং বিচারজনিত সমস্ত অবস্থা বা তত্ত্বকেই তারা অস্বীকার করে। কাজেই তাদের কাছে নৈতিক মুল্যবোধ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে আল্লাহর আনুগত্যে যেমনি পুরস্কারের আশা নেই, বিদ্রাহেও তেমনি শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। এরাও নাস্তিকদের দলে গণ্য। কারণ মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস যেমন আবশ্যক, পরকালে বিশ্বাসও তেমনি আবশ্যক। তবে এরা পরম সত্তা ও তাঁর বিশেষণাদিতে বিশ্বাস করলেও পরকাল ও তাঁর বিচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করে না।

অস্তিবাদিগণ আধুনিক দার্শনিকদের দলভুক্ত। তাদের মধ্যে এরিস্টটলের গুরু প্লেটো ও তাঁর গুরু সক্রেটিসের নাম উল্লেখযোগ্য। এরিস্টটল তর্কশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন, দর্শনের আলুলায়িত কেশকে সুবিন্যস্ত করেন করেন, তখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় নি এমন সব দার্শনিক তথ্যাবলি। আবার যে সব তথ্য তখনও সাধারণভাবে অজ্ঞাত বা অবোধ্য ছিল তা-ও তিনি তখনও করে পরিপূর্ণ দর্শন হিসাবে দাঁড় করান এবং গ্রহণযোগ্য ও বলিষ্ঠভাবে তিনি সেগুলোকে সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরনে।

এরা প্রথমোক্ত সম্প্রদায়কে বলিষ্ঠতায় সাথে রুখে দেন এবং তাদের মতবাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো এত বিস্তারিত- রূপে বর্ণনা করেন যে, আজ আর কারো এ ব্যাপারে পরিশ্রম করার দরকার নেই। যেন, আল্লাহ বিশ্ববাসীদের মরণ-যন্ত্রণা- থেকে মুক্তি প্রদান করেছেন। (আল-কুরআন)

বিশেষ করে এরিস্টটল, প্লেটো ও সক্রেটিসের দর্শনকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব হয় নি। তাদের এবং তাদের পরবর্তী মুসলমান দার্শনিক তথা ইবনে সিনা ও ফারাবীর চিন্তা ধারায়ও নাস্তিক্যবাদের প্রভাব দেখা যায়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তারা যে সাফল্য ও

বিশ্বস্বতার সাথে এরিস্টটলীয় দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন এর তুলনা বিরল। চেষ্টা অনেকেই করেছেন, সাফল্যের বিচারে কেউই তাদের সমকক্ষ হতে পারেন নি। কেননা অন্যান্যদের আলোচনায় অনেক ক্ষেত্রেই সত্যাল্প, অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান থেকে গেছে। অতএব তাদের বক্তব্য প্রায় অবোধ্য এদের কোন জবাব দিতে গেলে, তা দিতে হয় অনুমান ভিত্তিক এবং গ্রহণযোগ্য কোন জবাব দিতে গেলে তা দিতে হয় অনুমান করে আর গ্রহণ করতে চাইলে তা করতে হবে অন্ধভাবে। আমার মতে অনুমানভিত্তিক জবাব নিষ্ফল ও দুঃসাধ্য এবং অন্ধভাবে কিছু গ্রহণ করা অসংগত ও অযৌক্তিক। মোট কথা, ইবনে সিনা ও ফারাবীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দর্শনকে আমরা মোটামোটি তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি–

১. নাস্তিক;

২. বেদআত এবং

৩. মোবাহ।

মোবাহ অর্থ যেগুলো গ্রহণ করায় কোন অপরাধ নেই বা বর্জন করা আবশ্যক নয়। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জ্ঞানের বিভাগ

আলোচনা ও গবেষণার সুবিধার লক্ষ্যে আমরা দার্শনিকদের আলোচ্য বিষয়গুলোকে মোটামুটি ছয় ভাগে বিভক্ত করে নিতে পারি যথা: (১) গণিত শাস্ত্র, (২) তর্ক শাস্ত্র, (৩) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৪) অধিবিদ্যা, (৫) রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং (৬) চরিত্র দর্শন।

অঙ্ক, জ্যামিতি এবং জোতির্বিদ্যা ও সৌরজগৎ গণিত শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম তত্ত্বের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই ধর্মের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছুই তাতে আলোচিত হয় না। নির্ভুল যুক্তি প্রমাণের ওপর এর ভিত্তি স্থাপিত। কোন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য এর দু'টি মরাত্মক কুফল রয়েছে।

প্রথম কুফল এই যে, গণিত শাস্ত্রের পরিচর্যাকারী মাত্রই সূক্ষ্মতায় অনুপ্রাণিত। আর অনুসৃত সূত্র ও যুক্তি-প্রমাণাদির বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তায় অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে, গাণিতিক সূত্রের মতো গণিতবিদদের দার্শনিকযুক্তি প্রমাণগুলোও নির্ভুল ও অখণ্ডনীয়। অবশ্য অন্যদের মুখে তাদের নাস্তিক্য ও বিভ্রান্তিমূলক কথার সমালোচনা এবং শরীয়তের বিদ্রূপাত্মক উক্তির কথা শ্রবণ করে তারা কখনো কখনো স্বীয় ভুলের জন্য অনুতপ্ত হতো বটে। তখনই আবার মনে মনে ভাবত যে, ধর্মের মাঝে যদি বাস্তবিকই কোন সত্য থাকত তবে যে সব জ্ঞানী ও গুনী মহাজনরা গণিত শাস্ত্রে অনুচর্চায় এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বাক্ষর রেখেছেন, তাদের নাস্তিক্য ও ধর্মদ্রোহীতার কথা স্থির নিশ্চত জানতে পারে, তখন এরাও তাদের সাথে সুর মিলায় এবং অনুসিদ্ধান্ত করে যে, সংগত কারণেই তারা ধর্মত্যাজ্য। এ শুভেচ্ছা অর্থাৎ ভুল বিশ্বাসের শিকার হয়ে বহু লোকই যে বিপথগামী হয়েছে। অথচ এ শুভেচ্ছা ছাড়া তাদের সিদ্ধান্তের জন্য অন্য কোন যুক্তি নেই। মজার ব্যাপার এই যে, আপনি এদের হাজারো বুঝার চেষ্টা করেন যে কোন ব্যাপারে অনন্য সাধারণ পারদর্শী ব্যক্তির সকল বিষয়ে উক্ত জ্ঞান আবশ্যক নয়, তাতে তারা মূলত হবে না এবং তাদের সম্পর্কে এ ভক্তদের বিশ্বাস ও আস্থা বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ন হবে না অধিকন্তু নিজ সিদ্ধান্তের যথার্থতার গর্ব করে তাদের বলতে শোনা যায় যে,

এ দার্শনিকদের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত এটা ধ্রুব সত্য যে, কোন আইনবিদ ও দার্শনিকের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়া আবশ্যক নয়। অনুরূপ তর্কশাস্ত্রে এমন কোন অনুসিদ্ধান্তও নেই, যুক্তিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে। মূল অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী রয়েছেন। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে পরম বুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও অন্য বিষয়ে তার বা তাদের অজ্ঞতা ও অপরিপক্বতা থাকতে পারে। এর উদাহরণ খুঁজতে হবে না। এ দার্শনিকদের কথাই লক্ষ করুন না। গণিত শাস্ত্রে তাদের যুক্তি প্রমাণগুলো অত্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহ নেই। অপরদিকে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের আলোচনা ও মতামত শুধু ধামাচাপা ও অনুমানভিত্তিক এ-ও সত্য। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এ পার্থক্যটা ধরা পড়ে না। যারা এর গভীর অনুসন্ধান করেছেন শুধু তারাই এ পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম।

গণিত-বিদ্যাভিলাষীদের জন্য এটা একটা মারাত্মক রোগ। ধর্ম কর্মের সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগ না থাকলেও এর অনুচর্চা দর্শনের ভূমিকা স্বরূপ। তাই ধর্মের ওপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে অতএব অনেকেরই যখন সে ময়দানে অবতরণ করতে হয় তখন যেন তারা ময়দানে নেমে দিক্‌ভ্রান্তে না হয় সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ ইতিহাস সাক্ষী যে, আলোচ্য বিষয়ের অনুচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে, কিন্তু নিজ মতাদর্শ ও ধর্মের পবিত্রতাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করে নি এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

দ্বিতীয় কুফল, অপক্ব জ্ঞানী ইসলাম দরদীগণ এর মূল কারণ। তাদের ধারণা যে, উক্ত দার্শনিকদের সত্যভ্রষ্ট আখ্যা দিয়ে তাদের সকল শিক্ষা দর্শন বর্জনই ইসলামী আকায়েদ ও চিন্তা ধারা হেফাজতের একমাত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। আর এরা করলোও তা-ই। এরা তাদের অংশ এবং গাণিতিক বিষয় অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ইত্যাকার বিষয়ক সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলোকে পর্যন্ত ধর্মের নামে ত্যাগ করেছে। শেষ পর্যন্ত জনগণ যখন অবহিত হলো যে, এ ব্যাপারে দার্শনিকদের অভিমত দৃঢ় ও মজবুত যুক্তি-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন তাদের অন্তরে দার্শনিকদের প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকল না উপরন্তু ইসলাম সম্পর্কে তাদের অন্তরে ভুল ধারণা ও সন্দেহের সৃষ্টি হলো। তারা

ভাবতে লাগল যে ইসলামের ভিত্তি অজ্ঞতা এবং ঈমানের ভিত্তি বৈজ্ঞানিক সত্যের অস্বীকৃতির উপর। এভাবে ক্রমশ দর্শন ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর তাদের আস্থা ও আসক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে ইসলামের প্রতি সৃষ্টি হয় তাদের মনে প্রবল অভক্তি ও অশ্রদ্ধা।

মোটকথা, অপক্ব জ্ঞান ইসলাম দরদীগণের হেফাজতের নামে মূল বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অস্বীকার করায় ইসলামের মারত্মক ক্ষতি হয়েছে। কেননা এমন একটি বিষয়কে ইসলামের নামে অস্বীকার করা হয়েছে যার সাথে ইসলামী শিক্ষার কোন বিরোধ নেই এবং এর কোন স্থানেই ইসলামকে আক্রমণ করা হয় নি। হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন: চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তায়ালার অন্যতম দু'টি নিদর্শন, তাদের গ্রহণের সাথে কারো মরা বাঁচার কোন সম্পর্ক নেই। যখন তোমরা এটা দেখতে পাবে তখন তোমরা নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কাজেই বুঝা যায় যে, গাণিতিক অনুসিদ্ধান্তকে ইসলাম কোনভাবেই অস্বীকার করে না। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ হয়ে থাকে। হাদীসটি এই– আল্লাহ যখন কাউকে তাঁর নূর দেখান তখন তারা আল্লাহের সমীপে বিনিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, ছয়টি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের কোনটিতেই এটা স্থান পায় নি। এই হচ্ছে গণিত শস্ত্রের অবশ্যম্ভাবী কুফল।

লজিক তথা তর্কশাস্ত্র

ইসলামের সাথে তর্ক শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন প্রমাণ, ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তিধারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রাথমিক শর্তাবলি সংস্থাপন প্রণালী, যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণের শর্তাবলি ও তাদের সুত্র বদ্ধ করার কৌশল প্রভৃতি হলো এর আলোচ্য বিষয়। আবার এতে জ্ঞান সম্পর্কেও আলোচনা হয়। তাদের মতে জ্ঞান দু' প্রকার তাসাওর এবং তাসদিক। তাসাওর অর্থ কোন কিছুর মূর্ত প্রতিচ্ছবি ছাড়াই শুধু সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে তার কল্পনা করা। তাসদিক অর্থ যুক্তি-প্রমাণাদির সাহায্যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা। সুতরাং এতে ইসলাম বিরোধী কিছু থাকার কথা নয়। মূলত এগুলো ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকদেরই অবদান। তর্ক শাস্ত্রবিদগণ তাদের সূত্রগুলোর সাথে তাদের পরিভাষা যোগ করবে এবং একে নানা ভাগে ভাগ করে বিষয়টির আলোচনাকে বিস্তৃত করেছেন মাত্র। মূলের সাথে এর পার্থক্য শুধু পারিভাষিক এবং আলোচনার ব্যপকতাভিত্তিক।

এখন প্রশ্ন হলো যে, এ পারিভাষিক পার্থক্যের কারণে ইসলামের কোথায় কিভাবে আঘাত আসছে বা এর কোন মৌলিক বিষয়ের সাথে বিরোধ ঘটছে, ফলে তর্কশাস্ত্রকে সম্যক বর্জন ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে? কোন মুসলমান যদি একে অস্বীকার করে তাহলে যুক্তিবাদীরা তার ব্যাপারে এ ধারণাই তো করবে যে, লোকটি একেবারেই বিবেক-বুদ্ধিহীন। শুধু তা-ই নয়। পরিণামে গোঁড়ামির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের অপরাপর অনুষ্ঠান সম্পর্কেও তাদের মনে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হবে। ইসলামের প্রতি জনসাধারণের এরূপ বিরূপভাব ও অশ্রদ্ধার জন্য তর্কশাস্ত্রবিদরাও দায়মুক্ত নন। তাদের শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনার সময় তাদের যুক্তিগুলো শর্তাবলির দিক দিয়ে যত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল ধর্মীয় বিষয়ে তাদের আলোচনা ততটা যুক্তি নির্ভর বা সারবান হয় নি। প্রায় শৈথিল্যের সাথেই তারা ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। তবে তর্কশাস্ত্রের যুক্তি ধারায় মন্ত্রমুগ্ধ কোন শিষ্য তার গুরুর মুখে যখন ধর্মবিরোধী কথা শুনতে পায় তখন সে স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাস করবে যে, এ-ও তর্ক শাস্ত্রের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রমাণ, অনুরূপ কষ্টি পাথরে পরীক্ষা এবং সমমানের অনুসন্ধান ও গবেষণার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। অস্তিবাদ সম্পর্কে নিজে কোনরূপ গবেষণা ছাড়াই ভক্তরা তাদের ধর্মবিরোধী মতামতগুলো বিশ্বাস করে। এ হলো তর্কশাস্ত্র অধ্যয়নের মারাত্মক কুফল।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

বিশ্বসৃষ্টি অর্থাৎ আকাশ বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র, অগ্নি-মৃত্তিকা, জীবজন্তু উদ্ভিদ জগৎ ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদির বিবর্তন, পরিবর্তন, ও তাদের গঠন প্রণালী এর আলোচ্য বিষয়। গবেষণার দিক দিয়ে এদের এ সব ডাক্তার মানবদেহ ও এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এদের বিবর্তনের গতি প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে চর্চা করেন তাদের সাথে তুলনা করা যায়। বিশেষ কয়েকটি বিষয় ছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের ন্যায় এর সাথেও ইসলামের কোন বিরোধ নেই। সর্বনাশা দার্শনিক গ্রন্থে আমি সে সব বিষয় উল্লেখ করেছি। উদাহরণ স্বরূপ, সকল প্রকৃতি বিজ্ঞানীই প্রকৃতিকে স্বাধীন এবং স্বয়ং সবল স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মনে করে। কিন্তু ইসলামী মতে প্রকৃতি তার হাতের যন্ত্রবিশেষ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রকৃতির নিজের মাঝে নেই। এ সবেরই নিয়ন্ত্রণের মালিক আল্লাহ। যথেচ্ছা কাজ করার অধিকার বা ক্ষমতা এগুলোর নেই।

অধিবিদ্যা (Theology or metaphysics)

এবিষয়ে দার্শনিকগণ অনেক হুমড়ি খেয়েছেন। আলোচ্য বিষয়ে তাদের আলোচনা যুক্তি প্রমাণের দিয়ে থেকে তর্ক শাস্ত্রের মতো বলিষ্ঠ ও দৃঢ় হয় নি। কাজেই তাদের মধ্যে অনেক মতান্তর সৃষ্টি হয়। ফারাবী ইবনে সিনার বর্ণনা অনুযায়ী এরিস্টটলীর দর্শন ইসলামী মতবাদের সাথে কিছুটা সাম স্যপূর্ণ মনে হয়। দার্শনিকদের ভ্রমাত্মক সমস্যা সর্ব সাকুল্যে বিশটি। তন্মধ্যে তিনটি নাস্তিক্যের পর্যায়ভুক্ত আর অবশিষ্ট সতেরটি বেদআত। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ও প্রতিকার সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের লেখা, "তুহফাতুল ফালাসিফাহ" গ্রন্থ পাঠ করুন। নিম্নের তিনটি বিষয়ে তাদের মতামত সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী।

১. দার্শনিকগণ বলেন, দেহের পুনরুত্থান নেই; শুধু আত্মাই পুরস্কৃত হবে বা শাস্তি ভোগ করবে; পরকালের আজাব আত্মাগত, দৈহিক নয়। আত্মা সম্পর্কে তাঁরা যা বলেছেন সে কথা ঠিক, কেননা আত্মারও অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু দৈহিক আজাবের কথা অস্বীকার করে তাঁরা ভুল করলেন এবং এ ধরনের সিদ্ধান্তের দরুন আল্লাহর আইনকেই অবিশ্বাস করলেন।

২. তাঁদের কথা, 'আল্লাহ কেবল সার্বিক জ্ঞান (Universals كلى) রাখেন, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো (Particulars جزئى) তিনি জানেন না' –এও সরাসরি কুফরী। কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "আকাশ বা পৃথিবীতে এক পরমাণু পরিমাণও তাঁর জ্ঞানের অগোচর নয়।" (সূরা: সাবা– ৩)

৩. দার্শনিকরা বলেন, "বিশ্বজগৎ অনন্ত ও অনাদি।" এ বিষয়ে কোন মুসলমানই এরূপ ধারণা পোষণ করেন না।

শেষ বিচারের দিবসে দেহের নয়, শুধু আত্মারই পুনরুত্থান হবে। সুতরাং শাস্তি ও শান্তি আত্মিক হবে দৈহিক নয়।

এ ছাড়াও তাদের আরো কয়েকটি ভ্রমাত্মক মতবাদ রয়েছে। তাদের মতে স্বীয় মৌল সত্তা বহির্ভূত কোন গুণ নেই। আল্লাহের জ্ঞান তাঁর সত্তাগত গুণ। অথাৎ আল্লাহ সত্তাগত জ্ঞানী এবং তাঁর সত্তা থেকে আলাদা নয় বরং তাঁর সত্তাই স্রষ্টা সত্তাই রক্ষা ও পালনকর্তা। এক কথায় তাঁর সত্তাই সব কিছু। কোন কর্মের জন্য তাঁর সত্তার অপর কোন সহযোগী গুণের প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে তাদের ধারণা অনেকট মুতাজিলাদের ন্যায়। সুতরাং তাদের যখন নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী বলা হয় না তখন এদের ক্ষেত্রেও নাস্তিক আখ্যা দেওয়া যায় না। কাউকেও নাস্তিক আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে অধৈর্য হওয়া অনুচিত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের রচিত– فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة (ফয়সালাতুত তাফরিকাত বাইনাল ইসলাম ওয়াল-যিন্দিকাহ) পাঠ করুন। তাতে আমরা এবিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জাগতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী বিধি বিধানের আলোচনাতেই তাদের আবদ্ধ রেখেছেন। আসমানী কিতাব ও প্রাচীন পণ্ডিতদের পরমপরায় প্রাপ্ত বাণী-সমুদয় ছিল তাদের মূলনীতির উৎস।

চরিত্র দর্শন

এর আলোচ্য বিষয় মানবাত্মা। তাতে মানবাত্মার গুণাবলি ও নৈতিকতার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া নৈতিকতার প্রকারভেদ এর উৎকর্ষ ও উন্নতির উপায় ইত্যাদিও তাতে আলোচিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিষয়টি দার্শনিকদের নিজেদের সৃষ্টি নয়। সুফিদের কাছ থেকে তারা বিষয়টি ধার করেছেন। এরা ছিলেন আল্লাহর প্রেমে আসক্ত, তারই স্মরণে আত্মনিবিষ্ট, দুনিয়াবিমুখ এবং আল্লাহের সান্ধানে লিপ্ত। তাঁরা যখন আধ্যাত্মিক সাধনায় ডুবে থাকতেন তখন আত্মার যাবতীয় গুণাগুণ, স্বভাব-প্রকৃতি ও এর

লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে তাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। তাঁরা মানুষের মঙ্গলার্থে সেগুলো বর্ণনা করতেন। দার্শনিকগণ নিজেদের বাতেন ভ্রান্ত মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারে সাফল্য অর্জনের মানসে সেগুলো সংগ্রহ করে নিজেদের শাস্ত্রে সংযোজন করেন। প্রাচীন দার্শনিক সময়ের সুফি সমাজের অস্তিত্ব ছিল। মূলত এমন কোন যুগই নেই, যেখানে এরূপ মহাজনদের আগমন হয় নি। সকল যুগেই আল্লাহর একদিন প্রেমাসক্ত বান্দা থাকবেন এ তাঁর শাশ্বত বিধান। তারা বিশ্বের কীলক। তাদের কল্যাণেই বিশ্ববাসী আল্লাহর রহমত লাভ করে থাকে। হজরত মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, তাদের কল্যাণেই তোমাদের ওপর বারিধারা বর্ষিত হয় আর তাঁদেরই উপলক্ষ্যে তোমাদের জীবনী প্রদান করা হয়। আর গুহাবাসীগণ ছিলেন তাঁদেরই দলভুক্ত। চরিত্র দর্শনে দার্শনিক মতবাদের সাথে নবি ও সুফিদের বাণী সংমিশ্রিত হওয়ার কারণে দু'টি আপদ সৃষ্টি হয়। একটি এর সমর্থকদের জন্য অপরটি এর বিরোধীদের জন্য।

বিরোধীদের বেলায় আপদটি খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। সংকীর্ণমনা ও দুর্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা চরিত্র দর্শনের সাথে দার্শনিকদের স্বীয় মতামতগুলো সংমিশ্রিত থাকায় পুরো দর্শনকেই অস্বীকার ও বিরোধিতা করে এবং এর বর্তমান বাহকদের নিন্দা করতে শুরু করে। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে, এরা পথভ্রষ্ট দার্শনিকদেরই শিষ্যমণ্ডলী। অতএব এরাও ভ্রান্ত। আর পথভ্রষ্টদের শিক্ষা অবশ্যই বর্জনীয়। এ ভাবে তারা চরিত্র দর্শনের ভাল ও স্বতঃসিদ্ধ কথাগুলোকেও পরিত্যাগ করে। এ যেন, আল্লাহ এক এবং যীশু তাঁর নবি কোন খ্রিষ্টানের মুখে এ কথা শোনে সে মুমিন নয়, শুধু এ কারণে তা অস্বীকার করা। অপরদিকে একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। খ্রিষ্টানদের অবিশ্বাসী বলা হয়। কারণ এই নয় যে তারা যীশুকে নবি হিসেবে মান্য করে। হজরত রসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে শেষ নবি বলে স্বীকার করে না কাজেই তাদের অবিশ্বাসী বলা হয়। তাদের অবিশ্বাসী আখ্যা দেওয়ার এ স্পষ্ট কারণটি অবগত হওয়ার পর তারা পথভ্রষ্ট, শুধু এ কারণে তাদের সৎ ও ন্যায়ভিত্তিক কথাগুলো উপেক্ষা করা কারো কাম্য নয়। ব্যক্তির বিচারে সত্যাসত্য নিরূপণ করা দুর্বল বুদ্ধি সমাজের একটি সাধারণ ব্যাধি। হজরত

আলী (রা) বলেছেনঃ ব্যক্তির বিচারে সত্যকে জানতে চেষ্টা করো না, সরাসরি সত্যকে জানতে চেষ্টা কর, তবে সৎ ব্যক্তিকে সহজেই চিনতে পারবে। সুধীমণ্ডলী এ নীতিই অবলম্বন করে থাকেন। বিভিন্ন মৌল নীতির বিচারে যা সত্য হিসেবে প্রমাণিত হবে, একজন সুধী তা-ই গ্রহণ করবে। এর ব্যাখ্যাতারা পরমার্থ সাধক, না অনর্থ উপাসক তা সে দেখবে না। সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি ভ্রষ্টতার মধ্যে ও সত্যের সন্ধান কর যায়। কেননা, সে জানে স্বর্ণ খনি থেকে কাদা বের হয় এবং স্বর্ণ সন্ধানীকে তা থেকেই খাঁটি স্বর্ণ বেছে বের করতে হয়। আবার কৃত্রিম ও আসল মুদ্রার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মেকী মুদ্রা-ব্যবসায়ীর সাথে দেনা পাওনা করতে ক্ষতি কি? কিন্তু সাধারণের অবশ্যই ধোঁকাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই তা থেকে তাদের দূরে থাকাই কর্তব্য। অনুরূপ সাঁতার জানে না, এমন ব্যক্তির জন্য সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করা উচিত নয়। তবে যে ব্যক্তি সমুদ্র পারি দিয়েছে, সমুদ্র সন্তরণ থেকে কে তাকে বাধা দিতে পারে? শিশুরাতো সাপ দেখে ভয় পাবেই কিন্তু যোগ্য সাপুড়ের তো আর তা হবে না। অবশ্য এ শ্রেণির লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। অযোগ্য লোকের সংখ্যাই অধুনা অধিক যদিও অনেকেই নিজেকে সুযোগ্য বলে ভেবে থাকেন। ভ্রষ্ট দার্শনিকদের রচিত গ্রন্থাবলির পাঠাভ্যাস থেকে এদের বিরত রাখাই সমীচীন হবে। কেননা, এরা প্রতিকার জনিত আপদ থেকে পরিত্রাণ পেলেও গ্রহণজনিত আপদ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না।

এ ক্ষীণবুদ্ধি সমাজ, যাদের মস্তিষ্কে দৃষ্টি যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষ হয় নি আর যাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সামনে দীনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং প্রকৃত স্বরূপ দিবাকরের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেন, তারাই আমার গ্রন্থাবলির বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত ধর্মতাত্ত্বিক মন্তব্য ও সত্যনিগূঢ় বক্তব্যগুলোর প্রতিবাদ করেছে। তাদের ধারণা যে আমার উক্ত কথাগুলো বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের রচনা হতে আহরিত এবং মানবিক মন মস্তিষ্কপ্রসূত। আসলে কথাগুলো সবই প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থাবলি দ্বারা সমর্থিত এবং অর্থের দিক দিয়ে সুফিদের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোথাও যদি দার্শনিকদের সাথে আমার বক্তব্যের মিল হয়ে গিয়ে থাকে তা নিতান্তই আপতিক।

কোন দার্শনিক মতামত যদি বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণের বিচারে সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং কোরান ও হাদীস এর সমর্থন পাওয়া যায় বা কোন প্রতিবাদ উল্লেখ না থাকে তাহলে তা বর্জন করার কোন সংগত কারণ রয়েছে কি? মন্দ লোক যা করে বা বলে তা সবই মন্দ, এ নীতি যদি স্বীকৃত হয় এবং দার্শনিকদের যাবতীয় রচনাই যদি নির্বিচারে বর্জন করা হয়, তাহলে কত সত্যই না আমাদের হারাতে হবে। আমাদের হারাতে হবে বহু কোরানের আয়াত, অসংখ্য হাদীসের ভাষণ আর শতশত সুফিসাধক ও মহাজনের মুল্যবান বাণী। নিজেদের ভাবধারা প্রণেতাগণ এগুলোকে নিজ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে, তা ছাড়া দার্শনিকগণ তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে, তা ছাড়া দার্শনিকগণ তাদের গ্রন্থে আছে এ দাবি তুলে অনেক সত্য আমাদের থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং জ্ঞানী সমাজকে সাধারণের তুলনায় উন্নতমনা, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উন্নত বিবেচনাসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য।

খাঁটি অমৃত ক্ষৌরকারের তাম্রপাত্রে রাখলেও তা অখাঁটি হয় না। অমৃতের বিশুদ্ধতার সাথে পাত্রের কোন সম্বন্ধ নেই। বিশুদ্ধতা অমৃতের প্রকৃতিগত গুণ। শুধু পাত্রের পরিবর্তনে এর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। অতএব বিশুদ্ধ অমৃত স্বর্ণপাত্রে যেমন বিশুদ্ধ তাম্র পাত্রেও তদ্রূপই বিশুদ্ধ।

সত্যাসত্য নিরূপণের ব্যাপারে প্রায় লোকের মাঝেই একটা ভাবালুতা দেখা যায়। নিজ আস্থাভাজন লোকদের অসত্য কথা মেনে নিতে তাদের কোন দ্বিধা বা সংকোচ হয় না। পক্ষান্তরে যাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ভাল নয় তাদের পরম সত্য কথাও তারা নির্বিচারে অগ্রাহ্য করে। তাদে মতে সত্যাসত্যর নিরূপক স্বয়ং সত্যাসত্য নিজে নয় বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এ হলো চরম গোমরাহি।

দ্বিতীয় আপদটি হলো দর্শনকে যারা পরিপূর্ণ গ্রহণ করেছে তাদের জন্য। যেমন একজন ব্যক্তি এখওয়ানুস সাফা পাঠ করছে। আদ্যোপান্ত পাঠ করে করে দেখা যায় যে, এর বক্তব্যগুলো কোরআন হাদীস ও সুফিদের দ্বারা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং সে তা সত্য বলে অবশ্যই গ্রহণ করবে। তবে এ সব পরম সত্যের সাথে চরম অসত্যও যে সংমিশ্রিত রয়েছে উক্ত খবর তার

নেই। সরল বিশ্বাসে সে কোরআন-হাদীস ও সুফিদের বাণীর সঙ্গে দার্শনিকদের কৃত্রিম সত্যগুলোকেও গ্রহণ করবে এবং ধীরে ধীরে বিপথে চলে যাবে।

এর আপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে সাধারণ লোকদের তাদের রচনাবলির পাঠাভ্যাস থেকে বিরত রাখতে হবে। যেমনি দূরে রাখা হয় সন্তরণ জানে না এমন লোককে সমুদ্রে অবতরণ হতে আর নিষেধ করা হয় শিশুদের সাপ নিয়ে খেলতে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই শুধু এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। সুধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। তবে সতর্ক ও দূরদর্শী যাদুকরের পক্ষে শিশুদের সামনে সাপ ধরা উচিত নয়। কেননা অজ্ঞতার দরুন শিশু তার অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হতে পারে। তদ্রূপ বিদ্যোত্তম ও সুধী সমাজেরও উচিত সাধারণের বরাবরে দার্শনিক সমস্যাদি আলোচনা না করা। যাদুকর সাপ নিয়ে অবাধে খেলতে পারে, কারণ বিষের প্রতিষেধক তার জানা রয়েছে। মুদ্রা বিশেষজ্ঞের মেকী মুদ্রাকরের সাথে লেনদেন করাতেও কোন ভয় নেই। কারণ খাঁটি ও মেকী মুদ্রার বৈশিষ্ট সে জানে। যাদুকর প্রয়োজনে নিজ প্রতিষেধক থেকে আকাঙ্ক্ষীদের দানে করে এবং মহাজন ও স্বীয় তহবিল থেকে অভাবীদের দান করে। তদ্রূপ সুধীমণ্ডলীরও উচিত কোরআন হাদীস ও দর্শন ইত্যাদির অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে সাধারণকে দান করা। জনগণের উচিত ভক্তির সঙ্গে তা গ্রহণ করা এবং দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি হতে আহরিত, নিছক এ অজুহাতে তা প্রত্যাখ্যান করা। শুধু সান্নিধ্য ও সংস্পর্শের দরুন সত্যাসত্যের প্রকৃতি ও মৌলিকত্ব আদৌ পরিবর্তিত হয় না। সাধারণের বোঝা উচিত যে সাপের প্রতিষেধক তারই দেহ নিঃসৃত বস্তু। এজন্য এটা বিষ নয়। অনুরূপ খাঁটি মুদ্রা মেকী মুদ্রাকরের থলীতে কৃত্রিম মুদ্রার সাথে একত্রে থাকলেও এর স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা কখনই নষ্ট হয় না। সত্যাসত্যের ব্যাপারেও একথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। সত্য যেখানেই থাক সত্যই এবং অসত্য যে অবস্থায়ই থাক অসত্যই। এ হলো দর্শনের কুফল।

তালিমিয়া (শিয়া) সম্প্রদায়

আমি দর্শনশাস্ত্রের পর্যালোচনা ইতি টানছি এবং এর দোষ-ত্রুটিগুলোর প্রতিকার করে অবসর হয়েছি। কিন্তু কর্তব্যানুপাতে এ যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বুদ্ধি যতই প্রখর হোক, তা পরিপূর্ণভাবে জড়ামুক্ত নয় এবং সব কিছু বুদ্ধিবৃত্তি আয়ত্ত করতে পারে না। অতএব সবরকম সমস্যার বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধান যথেষ্ট বা সম্ভবপর নয়। অতএব ভাবছিলাম, আমার সমস্যা সমাধানের যথার্থ উপায় কী। ঠিক সে সময় তালিমিয়াদের মাঝে এক শ্রেণির চিন্তাবিদের আবির্ভাব হয়। তাদের অভিমত হলো যে, কোন বিষয়ে সম্যক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য পথ, কোন খাঁটি ইমামের অনুকরণ করা। তাদের ব্যক্তিত্ব এমনই মহান যে মহানবি ﷺ-এর সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকে। স্থির করলাম তাদের মতবাদকেও আমার যাচাই করে দেখা উচিত এবং তাদের গ্রন্থাবলিও পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। খোদারই মহিমা রাজধানী হতে একখানা পত্র পেলাম। বাদশাহের আদেশ, তালিমিয়াদের মতবাদ সম্পর্কে আমাকে একখানা বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করতে হবে। তাদের মাজহাব ও মতবাদের যাবতীয় রহস্য ও তাৎপর্য জানা দরকার। অনুরূপ একটা বাসনা আমার নিজের মনেও ছিল। বাদশাহের আগ্রহ দেখে তা আরো জোরদার হলো।

এরপর আমি তাদের গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করি। তাদের পূর্বাপর সমস্ত গ্রন্থ ও পুস্তিকা সংগ্রহ করে এক বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতিতে আমি সেগুলো সাধারণ্যে প্রকাশ করি এবং এক এক করে এগুলোর সমুচিত জবাব প্রদান করি।

কোন কোন সুধী আমার এ কাজে আপত্তি তুললেন। তাঁরা অভিযোগ করে বললেন, তোমরা তালিমিয়াদের অস্পষ্ট কথাগুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছ এবং শ্রেণিবদ্ধ করে দিয়েছ তাদের বিক্ষিপ্ত এলোমেলো যুক্তি প্রমাণগুলোকে। এ কাজ তারা নিজেরা চেষ্টা করে করতে পারত না। একদিক দিয়ে তাদের অভিযোগ ঠিকই ছিল। হারেস মুহাসেবি যখন মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনায় লিপ্ত হজরত আবু হানিফাও তখন তাতে তদ্রূপ একটি আপত্তি

তুলেছিলেন। ইমাম সাহেবের কথা হলা, বেদআতের প্রতিকার হওয়া আবশ্যক সন্দেহ নেই তবে, প্রথম তাদের অস্পষ্ট মতবাদকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে এবং তাদের বিক্ষিপ্ত যুক্তিগুলোকে শ্রেণিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নিয়ে তারপর তার প্রতিকার করতে গেলে, ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তা এই যে, হতে পারে পাঠকবৃন্দ তাদের বিভ্রান্তিকর মতবাদের দ্বারাই অনুপাতে বেশি অনুপ্রাণিত হবে এবং প্রতিকারের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবে না। কিংবা ভ্রূক্ষেপ করলেও এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবে এবং বিভ্রান্তিকর মতবাদই তাদের অন্তরে স্থায়ী হয়ে বসবে।

যে-কোন প্রসিদ্ধ মতবাদের ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের এ আপত্তি যথার্থ, সন্দেহ নেই। কিন্তু যা ইতঃপূর্বে বহুল প্রচারিত তার প্রতিকার হওয়া একান্ত অপরিহার্য। প্রতিপক্ষীয় মতবাদের যথাযথ উদ্ধৃতি ব্যতীত এর সাফল্যজনক প্রতিকার সম্ভব নয়। তবে তাদের মতবাদের সুবিন্যস্ত আলোচনার কারণে কৃত্রিম সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অতএব আমি তা-ই করেছি। আমার একজন বন্ধুর সন্দেহ দূর করতে গিয়ে আমাকে এটা করতে হয়েছে। তিনি ইতঃপূর্বে তাদেরই সদস্য ছিলেন, তার কাছে জানলাম যে, প্রতিপক্ষের জবাব নিয়ে নাকি তাদের মধ্যে বিদ্রূপ চলে। তাদের কথা হলো যে, প্রতিপক্ষ তাদের যুক্তি প্রমাণগুলো সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা না করেই উত্তর দিয়ে থাকে। তখন থেকেই আমি সিদ্ধান্ত করব এবং পরে এক এক করে এদের জবাব দিয়ে যাব। যেন বলতে না পারে, আমি তাদের অভিযোগগুলো না বুঝেই জবাব দিয়েছি। মোটকথা, আমি তাদের মতবাদকে যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করে এর দোষ-ত্রুটিগুলো খতিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি।

এ ব্যাপারে আমার গবেষণার সারমর্ম এই যে, এ একটি সম্পূর্ণ বিত্তিহীন ও অর্থহীন মতবাদ এবং অজ্ঞ ইসলাম দরদী সমাজের ভ্রান্ত প্রতিকার পদ্ধতিই এর প্রসারতার জন্য দায়ী; তাদের অহেতুক বিরোধিতা ও গোঁড়ামিই তাদের বিক্ষিপ্তাকার বেদআতগুলোকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছে। নতুবা স্বকীয়তায় এগুলো নেহায়েত দুর্বল ও অগ্রাহ্য ছিল। ক্রমশ তারা এমন হয়ে যায় যে এদের সত্য কথাগুলোকেও তারা স্বীকার করতে রাজি হলো না।

তালিমিয়াগণ যদি বলে যে, আধুনিক বিশ্বের সংস্কার করতে হলে একটা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য যোগ্যতম শিক্ষকেরও প্রয়োজন, তবে তারা এমন বলছে না এরা যদি বলে যে আধ্যাত্মিক দীক্ষার জন্য আধ্যাত্মিক গুরু গ্রহণ করা জরুরী, তা-ও তারা যথাপূর্ব অর্থাৎ পরে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে শিক্ষা দর্শন সম্পর্কিত তাদের যাবতীয় আলোচনা করেছে। ফলে শিক্ষা দর্শন সম্পর্কিত তাদের সকল আলোচনা জনসাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ও অর্থহীন প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, তালিমিয়াদের মতবাদই সঠিক আর বিরোধীদের মতবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ, অথচ তাদের ভুল প্রতিবাদ পদ্ধতির ওপরই যে জনগণের ভুলের ভিত্তি তা-ও তারা উপলব্ধি করতে পারে নি। মূলত তাদের উচিত ছিল, প্রতিপক্ষের দাবি গ্রাহ্য করে প্রকাশ্যে বলে দেওয়া যে, বিশ্ব সংস্কারের জন্য একটা শিক্ষা পদ্ধতি একজন শিক্ষাগুরুর দরকার, সন্দেহ নেই। অবশ্য এ উদ্দেশ্য আমরা হজরতে ﷺ-এর সুমহান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শাশ্বত শিক্ষা পদ্ধতিকে ইতঃপূর্বেই গ্রহণ করে নিয়েছি। যদি তারা বলে যে, তোমাদের ইমামও তো সবসময় তোমাদের সাথে থাকেন না। যদি তারা বলে যে, বিভিন্ন নসিহত শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীর কোণে কোণে তা প্রচারের লক্ষ্যে আমাদের ইমাম কোন ব্যাপারে তোমাদের অসুবিধা হলে আমার নিকট এসে জেনে নিবে, আমি তোমাদের ধ্যানে রইলাম। আমরা তখন বলব যে, হজরত মুহাম্মদ ﷺ তো দীনকে সম্পূর্ণ করে রেখে গেছেন এবং এর প্রচারার্থে তঁর একটি সংগঠিত দলও রয়েছে। প্রমাণ আল-কোরআন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ *

আজ আমি তোমাদের দীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম। অতএব ঈমাম সাহবের অনুপস্থিতিতে আপনাদের যখন কোনরূপ ক্ষতি হয় না, তখন দাওয়াতকর্ম পূর্ণ করতে আমাদের গুরুজনের তিরোধানের কি অসুবিধা হতে পারে? এরপর প্রশ্ন উঠতে পরে যে, কোরআনে স্পষ্ট কোন সমাধান নেই, এমন সমস্যাদির সমাধান কিভাবে করব। অনরূপ সমস্যায় হজরত মায়াজ যা করেছেন, আমরাও তা-ই করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল ব্যক্তিদের শিক্ষার লক্ষ্যে (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছেন যারা ফল প্রকাশে স্বীয় ইজতেহাদ করতে পছন্দ করেছেন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِىْ اِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِىْ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ قَالَ اَجْتَهِدُ رَائِىْ وَلاَ اٰلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يَرْضٰى بِهٖ ⊛

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজরত মায়াজ (রা)-কে (ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিয়োগ করে প্রেরণ করলেন তখন) জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কিসের ভিত্তিতে হুকুম কর? আরজ করলেন, আল্লাহর কিতাব মোতাবেক। তিনি বললেন, যদি সেখানে না পাও? আরজ করলেন, সুন্নতে নববী মোতাবেক। তিনি বললেন, যদি তাতেও না পাও? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি ইজতেহাদ দ্বারা কর্ম সম্পদান করি। তিনি বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দানের পূর্বেই এর উপর আমল শুরু করেছ (তারপর অনুমতি প্রদান করে বললেন), আল্লাহ তায়ালার শোকর, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতকে তিনি আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করার তওফিক দান করেছেন। (আবু দাঊদ, দারামীর বরাতে মেশকাত ৩২৪ পৃষ্ঠা)

তুমি এ থেকে বুঝে নিতে পার যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজরত মায়াজ (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

ইসলামের আহ্বান নিয়ে তিনি ইয়েমেনে প্রেরিত হলেন। সেখানে তিনি কোরআনের ভিত্তিতে সকল সমস্যার সমাধান করেছেন। তবে যেসব

সমস্যার সমাধান কোরআন শরীফে না পেতেন, সে সব ব্যাপারে তিনি কিয়াস ও নিজ বুদ্ধি বলে সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করতেন। আর তোমাদেরও তো তা-ই করতে হয়। কেননা তোমরা যখন তোমাদের দাওয়াত নিয়ে দূর-দূরান্তে যাও, তখন তোমাদের ইমাম সাহেব তো আর তোমাদের সাথে থাকেন না। সেখানে তোমাদের নিত্য নতুন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তোমরা সেগুলোর সমাধান করো– হয় কুরআনের সাহায্যে নয়তো নিজ নিজ ইজতেহাদের সাহায্যে। আর এ ব্যতীত উপায়ই-বা কী? কারণ ঈমামের উপদেশ ও আল-কুরআনের নির্দেশ মৌলিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ। অপর দিকে খুঁটি-নাটি সমস্যা এত বেশি যে, দুনিয়ার সমস্ত আইনশাস্ত্র মিলেও এক সময় তা বর্ণনা করে দিতে পারবে না। সুতরাং ইজতেহাদ ও কিয়াসের শরণাপন্ন না হয়ে গত্যন্তরই নেই। প্রত্যেক ব্যপারে ইমামের সমাধানের জন্য ইমামের কাছে আসতে তার মৃত্যুর ঘটতে পারে। তাহলে তো সমাধানের কোন সার্থকতাই থাকল না।

কোন জনহীন স্থানে কেবলা অজ্ঞাত থাকে, এমন নামাযীর জন্য কিয়াস ব্যতীত নির্ধারণের অন্য কী উপায় আছে? এজন্য ইমামের শরাপন্ন হতে হলে তাকে অনেক নামাযই হারাতে হবে। সুতরাং সময বিশেষ নিজ কিয়াস ও বুদ্ধি প্রয়োগ অপরিহার্য। এ কারণেই বলা হয় যে, ভ্রান্ত ইজতেহাদে একটি পুণ্য রয়েছে আর অভ্রান্ত ইজতোহাদে (Independent Judgement) দু'টি পুণ্য রয়েছে। একটি শুধু ইজতেহাদের জন্য অপরটি তার বিশুদ্ধতার জন্য। সুতরাং ইজতেহাদের বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধতার একটা মনোভাব পোষণ করা হয়, এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল এমনটি বলা যায় না। কেউ যদি প্রকৃত অভাবী নয়, এমন ব্যক্তিকে অভাবী জ্ঞান করে কিছু দান করে সেজন্য সে অপরাধী হবে না। কেননা সে তার ইজতেহাদ ও ভুল বিচারে অভাবী সাব্যস্ত করেই তাকে দান করেছে।

এখন প্রশ্ন হলো যে, ইজতেহাদের সিদ্ধান্ত দু'জনের যদি দু'রকম হয় তখন কী করা যায়? সে ব্যাপারে আমরা প্রত্যেককে তার নিজ নিজ বুদ্ধি ও কিয়াসের অনুসরণ করার পরামর্শই দেব। যেমন কেবলা নিরূপণের ব্যাপারে

মতান্তর দেখা দিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণানুযায়ী কার্য সম্পন্ন করে থাকে, যদি একের ধারণা অপরের বিপরীতও হয়।

এখন পশ্ন উঠতে পারে যে, মুকাল্লিদগণ স্ব-স্ব বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, জীবনের বিভন্ন ক্ষেত্রে হজরত আবু হানিফা শাফেয়ী প্রমুখ ইমামদের মতামত দ্বারা পরিচালিত হয় কেন? অথচ সকলেরই উচিত, নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং নিজ কিয়াস ও রায় অনুসরণ করা। আমাদের রায় হলো মুকাল্লিদদের তাকলিদ এবং কেবলা নির্ধারণে পরস্পর বিরোধী ব্যক্তিদ্বয়ের স্ব স্ব মতের অনুসরণ করার মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। আসল কেবলা নির্ধারণেচ্ছু ব্যক্তি নিজ বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত, এ ব্যাপারে শুধু তারই মতের অনুসরণ করবে। আর এ তাকলিদ প্রকৃত যেন নিজ ব্যায় অনুরূপ পর্যায়ে গণ্য।

ইজতেহাদ ভুলও হতে পারে, এ বিশ্বাস রেখেই। নবি ও ইমামগণ ধর্মের অপরিহার্য প্রয়োজনে এ কাজ করেছেন।

হজরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন:

اَنَا اَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ ـ

আমি বাস্তবতার নিরীক্ষা মীমাংসা করি আর, আল্লাহ গুপ্ত রহস্যাদির সন্ধান রাখেন। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য ও প্রমাণ দৃষ্টে বিচার করে থাকি। সুতরাং সেটা সঠিক না-ও হতে পারে। কেননা, সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে। মোদ্দাকথা, আমি মানুষ আমার ইজতেহাদ ও রায় ভুল হওয়া সম্ভব। নবিদের ইজতেহাদের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যান্যদের ইজতেহাদ সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এমনটি বিশ্বাস করা যায় কি।

আমার উপরিউক্ত মতামত সম্পর্কে তালিমিয়াদের দু'টি প্রশ্ন রয়েছে–

প্রথম প্রশ্নঃ ইজতেহাদযোগ্য বিষয়ে আপনার উপরিউক্ত মতামত ও পরামর্শ পুরোপুরি সত্য, সন্দেহ নেই। তবে আকায়েদ সম্পর্কে ভুল ইজতেহাদকারী সম্পর্কে আপনার রায় কী? তাঁকে তো ক্ষমা জ্ঞান করা হয় না।

আমার জবাবঃ খুবই সহজ। কেননা ইসলামের মূলনীতি ও মৌল বিধানগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট বর্ণিত রয়েছে। বিতর্কমূলক বিষয়গুলোকে যুক্তি প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের শর্তাবলির ব্যাপারে– قسطاس المستقيم "কিস্‌তাসুল মুস্তাকিম" কিতাবে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা এর পাঁচটি মূলনীতি নির্দেশ করেছি। এগুলোর যথাযোগ্য প্রয়োগ হলে যে কোন প্রকার সমস্যার নিশ্চিত সমাধান সম্ভব।

এখন কষ্টি পাথরকে যদি কেউ অস্বীকার করে, তা করতে পারে। অবশ্য নির্বিচারে এগুলোকে অস্বীকার না করে যত্নের সাথে যাচাই করে দেখা কর্তব্য। আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা কেউ করে না, কারণ এ মূল নীতিগুলো সরাসরি কুরআন থেকে গৃহীত। তর্কশাস্ত্রবিদগণ পারবে না কারণ, তাদের শাস্ত্রে এগুলো করতে সক্ষম হবে না, কারণ, এগুলো মূলত তাদের শাস্ত্রে অযাচিত ব্যবহৃত যুক্তি প্রমাণাদির ব্যাখ্যাস্বরূপ।

প্রতিপক্ষ অভিযোগ করতে পারে যে সত্যাসত্যের নিরূপক কষ্টিপাথর আমার হাতে থাকা সত্ত্বেও আমি বর্তমান বিশ্বের সব মতান্তর মিটিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করছি না কেন?

আমাদের উত্তর খুবই সোজা। জনগণ আমাদের উপদেশগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করলে বিরোধ সহজেই চুকে যায়। আপনিও যদি এগুলোর আলোকে একটু চিন্তা করেন, তবে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, কোনটি অসত্য। তবে সেগুলোর প্রতি তাদের আদৌ শ্রদ্ধা বা আগ্রহ নেই। একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা আমাদের উপদেশগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছে। ফলে তাদের পারাস্পরিক মতান্তর চুকে গিয়েছে। তাদের মাঝে পরম শান্তি বিরাজমান।

আপনাদের ইমামের দাবি যে, স্বীয় আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে অবাধ্যদের তিনি সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম। তাঁর এ দাবি যদি আদৌ সত্য হয়, তাহলে জনগণ আজও শতদলে বিভক্ত, এটা কেমন কথা! ইমামদের ইমাম হয়েও হজরত আলী (রা) যখন পুরোপুরিভাবে এ বিরোধ নিরোধ করতে সক্ষম হলেন না, তখন আপনাদের ইমাম সাহেব এত অসাধারণ শক্তি কোথা থেকে পেলেন? ইমামগণ জনগণকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য করতে

পারেন, ইমামদের ব্যাপারে আপনাদের এ বিশ্বাস কতটা সংগত, জানি না। অবশ্য, আজ পর্যন্ত এমন নজির দেখা যায় নি। এখন প্রশ হলো, যে এ বিরোধ আর কতকাল স্থায়ী হবে? এর বিরোধ অভিমান এখনও কি শুরু হবে না? সত্য কথা বলতে কি আপনাদের কল্পিত ইমামের প্রচেষ্টায় বিরোধ আদৌ কমে নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে অতি ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ভয় হচ্ছে, খোদা না করুন, বিরোধ যদি আত্মকলহ ও ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে, তাহলে ইসলামী বিশ্ব ধ্বংস হবে আর মুসলিম সাধারণের দুরবস্থায় সীমা থাকবে না।

তালিমিয়াদের দ্বিতীয় প্রশ্নঃ আপনি বিরোধ নিরোধের পক্ষপাতী এটা স্বীকার করি। তবে বিভিন্ন মত ও পথের দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিগত পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য শুধু আপনার কাছেই গমনাগমন করবে; আপনার বিরোধীদের কাছে মোটেই যেতে পারবে না এমন কি কথা আছে? অথচ বিরোধীদের সংখ্যাও তো নগণ্য নয় এবং আপনার ও তাদের মধ্যে বাহ্যত তেমন অমিলও তো দেখা যায় না।

আমার জবাবঃ এই যে, প্রশ্ন আপনাদের যথার্থ। কিন্তু এ প্রশ্ন অন্যদের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। ধরুন, একজন পথভ্রষ্টকে আপনি সত্যের প্রতি আহ্বান করছেন। কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন যে, প্রতিপক্ষের তুলনায় কোন দিক থেকে আপনি শ্রেষ্ঠ, যেজন্য সে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে?

এর জবাবে আপনারা কী বলবেন, তা আমার জানা নেই হয়ত বলবেনঃ আমাদের ইমামের মতের সমর্থনে প্রত্যক্ষ প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট থেকে ন্যায়ত এ প্রত্যাদেশ আদৌ শুনে নি কেন সে তা স্বীকার করবে, বরং সে নিশ্চয় এ কথা শুনেছে যে আপনার এ দাবি ভ্রান্ত ও বেদআত।

ধরুন, কেউ প্রত্যাদেশকে বিশ্বাস করলো। তবে সে-ব্যক্তি যদি নবুয়াতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়? তখন হয়ত আপনারা নতুন কোন পন্থাবলম্বন করবেন, বলতে পারেন, আমাদের ইমাম নিজের যথার্থতার প্রমাণে হজরত ঈসা (আ)-এর মতোই উচ্চমানের মুজিযা প্রদর্শনে সক্ষম। ধরুন ইমাম

সাহেব সে ব্যক্তির মৃত পিতাকে জীবিত করে দেখালেন আর স্বীয় দাবির ওপর সত্যের মোহর মেরে দিলেন। তবে সে যদি বলে যে অনুরূপ কথার উপর সত্যের মোহর মেরে দিলেন। কিন্তু সে যদি বলে যে অনরূপ মুজিযার দ্বারা কেমন ক'রে তাতে পরিতৃপ্ত হই? মূল কথা এই যে, মুজিজা সম্পর্ক অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক রয়েছে। উন্নত চিন্তা ও বলিষ্ঠ প্রমাণাদি ব্যতীত এগুলোর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। আর আপনারা তো চিন্তা ও প্রমাণাদির সূক্ষ্মতার বিশ্লেষকদের স্বীকারই করেন না।

মুজিযা সত্য ও সাধুতার প্রমাণ বটে। তবে কখন? যখন যাদুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয় এবং স্পষ্টরূপ বাতলে দেওয়া হয় যাদু ও মুজিযার স্বাতন্ত্র্য। তবে এটা খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ মানুষকে কখনও বিভ্রান্তিমূলক পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন না, এ কথা স্বীকৃত হলেই শুধু মুজিযা নবুয়াতের প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। কেবল মুজিযা নবুয়াতের প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। তবে এটা প্রমাণ করা কি আদৌ সহজসাধ্য ব্যাপার? যদি তা সহজ না হয় তবে আপনারা প্রশ্নাবলির কী উত্তর দেবেন? এমতাবস্থায় যে বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রমাণাদিকে আপনারা উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন, তার আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর কোথায়? হয়ত শেষ পর্যন্ত আপনারা সে পন্থাও গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের দাবি যদি প্রমাণাদির দিক হতে আপনাদের দাবির চেয়ে জোরদার হয়, তখন আপনাদের দিক থেকে আপনাদের দাবির চেয়েও জোরদার হয়, তখন আপনাদের উপায় কী? মোটকথা, এ এমন একটি চক্রজাল যা থেকে তারা সবাই মিলে চেষ্টা করেও নিস্তার লাভ করতে পারবে না।

অবশ্য এ ব্যাপারে দুর্বল তর্কবিদগণ তাদের এ প্রশ্নগুলোকে তাদের উপর প্রত্যারোপ না করে এমনি সুদীর্ঘ জবাবাদি দিতে আরম্ভ করেন, যা না সহজবোধ্য ছিল, না প্রতিপক্ষের গ্রহণযোগ্য ছিল।

উক্ত আলোচনার আলোকে কেউ যদি আমাকে প্রতিবাদ করে বলে, জনাব, আপনিই বা এমন কী সাফল্য দেখালেন; এতো চক্রের প্রতিবাদে প্রতিচক্রই হলো! এ চক্রের হাত থেকে না অপনি মুক্তি পেলেন, না আপনার

প্রতিপক্ষ মুক্তি পেল। প্রশ্ন এই যে, এর কোন সার্থক ও তথ্যপূর্ণ জবাবও রয়েছে কি?

আমি বলব রয়েছে এবং তা এই– যে কোন বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমরা প্রথমেই বলব, যে বিষয়ে তার দ্বিধা রয়েছে তা নির্ণয় করতে। কেননা অনির্দিষ্টভাবে দ্বিধা ও বিমূঢ়তার প্রতিকার সম্ভবপর নয়।

যার সমস্যা নির্ণিত নয় অথচ সমাধানের জন্য ব্যস্ত, রোগের কথা গোপন রেখে প্রতিকার চায় এমন ব্যক্তি তার উদাহরণ। এমন রোগীকে স্বভাবতই বলে দেওয়া হবে যে মাথাব্যথা কিংবা কলেরা ইত্যাকার নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে, তবে অনির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করতে পারে এমন কোন ডাক্তার নেই। সে যখন বিমূঢ়তা ও সন্দেহযুক্ত স্থান বা বিষয়গুলো চিহ্নিত করবে আমি উক্ত পাঁচটি মূলনীতির আলোকে অতি সহজেই এদের সত্যাসত্য প্রমাণ করে দেখাব। তখন প্রত্যেকেই স্বীকার করবে যে, এ পাঁচটি মূলনীতি যে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণের প্রকৃত ও নিশ্চিত কষ্টি পাথর। আরো স্বীকার করবে যে, প্রমাণাদির প্রামণ্যতা যাচাইয়ের ব্যাপারে এগুলোর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন নিক্তি হতে পারে না। অবশ্য নিক্তি ও পাল্লার যথার্থ সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষের এমনি প্রত্যয় জন্মাবে যেমনি প্রত্যয়ী হয় গণিত ও অঙ্ক শাস্ত্রধ্যায়ীগণ সে বিষয় ও বিষয়দির প্রতি। এ পাঁচটি মূলনীতি আমি আমার স্বরচিত গ্রন্থ "কিসতাসুল মুসতাকীম"–এ সবিস্তারে আলোচনা করেছি। আগ্রহশীলমাত্রেই সেখান থেকে জেনে নিতে পারেন। অন্যদের মাজহাবের ত্রুটি বিশ্লেষণ এখানে আমর উদ্দেশ্যে নয়। কেননা তা থেকে অনেক পূর্বেই আমি মুক্তি পেয়েছি। এব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তি আমার আল-মুসতাযহার গ্রন্থটিও পাঠ করতে পারেন। এ সম্পর্কে আরোপিত সকল অভিযোগের জবাবে এটা রচিত। মুফাস্‌সালুল খেলাসা দেখুন। গ্রন্থখানা বারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এতে হামদানজীবনে আমার ওপর নিক্ষিপ্ত যাবতীয় প্রশ্নবাণের উত্তর দেওয়া আছে। আল-দরজ পাঠ করুন। তাতে যথারীতি গ্রন্থটিও পাঠযোগ্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের পরখ করার জন্য কোন কষ্টি পাথর যথার্থ তাতে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণ দ্বারা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নুতন ইমামের আদৌ কোন দরকার নেই।

মোটকথা, মতবিরোধের এ আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় তালিমিয়াদের নিকট নেই। অধিকন্তু নিজেদের ইমামত পথের স্বপক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণও তাদের নিকট পাওয়া যায় না।

দীর্ঘকাল অতীতে আমি তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছি। তখন তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সন্দেহ নেই এবং যোগ্য শিক্ষকের দরকারও অনস্বীকার্য। আর তোমাদের মনোনীত ইমাম খাঁটি, দুর্বলের মতো একথাও আমি স্বীকার করে নিলাম। তবে প্রশ্ন এই যে, তোমরা তার কাছ থেকে কী শিখেছ এবং আধ্যাত্মিকতার কী সন্ধান পেয়েছ? সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমার উপস্থাপিত সমস্যাদির যথার্থ সমাধান তো পরের কথা, তারা এগুলো বুঝতেই সক্ষম হয় নি। পরিশেষে তারা আমার অভিযোগগুলোকে অনুপস্থিত ইমামের স্কন্ধে ন্যস্ত করে এবং তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে এগুলোর উত্তর সংগ্রহ করতে হবে বলে অজুহাত দেখায়। আশ্চর্য যে, যে ইমামের অন্বেষণে তারা আজীবন মগ্ন, আর স্ব-স্ব ধারণা মতে তারা তাঁকে ইতঃপূর্বে পেয়েও গিয়েছে এবং তাতে তারা বেশ আনন্দও পাচ্ছে। কিন্তু অপদার্থরা তার নিকট থেকে কিছুই শিখতে পারে নি, তাদের জ্ঞানভণ্ডার, তথাপূর্ব শূন্যই পড়ে রয়েছে। একজন ব্যক্তি, শরীর তার অপবিত্র, সে পানির অন্বেষণে ঘুরছে। তাকে পবিত্র হতে হবে। পানিও সে পেলো। তবে পবিত্র হওয়ার কাজে ব্যয় করল না, এ ব্যক্তিই এদের উদাহরণ।

তালিমিয়াদের কেউ কেউ আবার দাবি করেছে যে, নিজ নিজ ইমামদের নিকট থেকে তারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু যে সব বিষয়কে তারা তাদের নিজস্ব বলে দাবি করেছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো সবই পিথাগোরাসের উপেক্ষিত দর্শন এরিস্টটল এগুলোকে বর্জন করেছে এবং প্রমাণিত করেছে যে, এগুলো খুবই দুবর্ল। এখনওয়ানুস সাফা গ্রন্থে এটা বিস্তৃত আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এগুলোকে দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করাও ভ্রান্তি। এতো শুধু ভরাট বস্তু।

খুবই পরিতাপের কথা, কোন ব্যক্তি আজীবন জ্ঞানানুসন্ধানে লিপ্ত থেকে ভাসা ভাসা জ্ঞানের ওপর যদি আস্থাশীল হয়ে পড়ে আর মনে করে যে, এটাই চরম ও পরম জ্ঞান।

এরাই উক্ত তালিমিয়া সম্প্রদায়। আমি তন্নতন্ন করে পরখ করেছি এবং গভীরভাবে লক্ষ করেছি তাদের ভেতর-বাইরে। চরমভাবে উপলব্ধি করেছি তাদের প্রচেষ্টাকে। তাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে এই যে, বর্তমান ধর্মীয় জটিলতা ও সংঘাত থেকে জনগণকে মুক্তি পেতে হলে একজন খাঁটি ইমামের প্রয়োজন, জনগণ একথা উপলব্ধি করুক। এ সব ক্ষীণ বুদ্ধি সাধারণ মানুষ এটাকে অস্বীকার করলে আরো বলিষ্ঠ প্রমাণ দ্বারা তারা এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে। আর কেউ যদি বলে যে, শিক্ষক বা ইমামের প্রয়োজনীয়তা আমি মানলাম। কিন্তু বলুন তো সে গুরুজনের নিকট থেকে আপনি কী জ্ঞান লাভ করেছেন? অন্তত তা থেকে কিছু আমাকে শিক্ষা দিন না। তখন সে শুধু এটাই বলবে যে, তোমরা শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছ এটাই যথেষ্ট। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো জ্ঞানার্জনের জন্য সাধনা করা। নিছক স্বীকৃতি আদায়ই ছিল আমাদের জন্য উচিত।

এর অধিক তারা অগ্রসর হবে না। কেননা, তারা বেশ করে জানে যে, আরো অগ্রসর হলে তাদের লজ্জা পেতে হবে। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষুদ্রতম সমস্যার সমাধানের সমর্থও তাদের নেই বরং সমস্যাগুলোর সম্যক উপলব্ধিও তাদের সাধ্যের অতীত। এই হলো তাদের জ্ঞানের আসল স্বরূপ। তাদের অতীত। এই হলো তাদের জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ। তাদের ব্যাপারে যতই তোমরা অনুসন্ধান চালাবে এবং বিচার বিশ্লেষণ করবে ততই তাদের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে। আমি তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি, তাদের থেকে পাওয়ার বা আশা করার কিছু নেই। সুতরাং তাদের থেকে আমি আমার আশার হস্ত গুটিয়ে নিয়েছি।

সুফিদের পথ

উক্ত শাস্ত্রসমূহের অনুসন্ধান ও অনুশীলন সমাপ্ত করে আমি সুফিবাদের অনুশীলন ও অনুধাবনে আত্মনিমগ্ন হই। এখানে আমার গবেষণালব্ধ সারবস্তু এই যে, সুফিবাদ শুধু জ্ঞান বা দর্শনের পথ বরং এটা জ্ঞান সাধনার সমন্বিত পথ। এর সারকথা এই যে, প্রবৃত্তির যাবতীয় দুর্জয় হামলাকে প্রতিহত করতে হবে, মনকে সম্পূর্ণরূপে বিকার ও দোষযুক্ত করে একমাত্র আল্লাহের উদ্দেশে নিয়োজিত করতে হবে এবং আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণের সাহায্যে আত্মাকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করার চেষ্টা করতে হবে।

এ পথে কৃচ্ছ্র সাধনা ও কর্ম করা অপেক্ষা তাঁদের সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করাই আমার পক্ষে সহজতর ছিল। তাই প্রথমত আমি সুফিবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো পড়তে আরম্ভ করি। সৌভাগ্যক্রম আবু তালেব মক্কী রচিত কুওয়াতুল কুলুব এবং হারেছ মুহাসেবীর গ্রন্থাবলি ছাড়াও জুনায়েদ, শিবলী, আবু ইয়াজিদ বুস্তামী এবং তাঁদের অতীত গুরুজনের বাণীসমূহও পর্যালোচনা করার আমার সুযোগ হয়েছে। চেষ্টা সাধনা ও পড়াশোনার দ্বারা যে কোন মানুষরে জন্য যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এখানে আমি তাঁদের সম্পর্কে ঠিক ততটুকুই অবহিত হয়েছি। তবে, যে পর্যন্ত পঠন পাঠনের সাধারণ সীমাকে অতিক্রম করে এর যথার্থ ও বাস্তব উপলব্ধি করতে না পারে এবং পুনর্গঠিত করতে না পারে নিজ স্বভাব ও নৈতিকতাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো জন্য সুফিবাদের মাহাত্ম্য ও গূঢ় তাৎপর্য করা সম্ভবপর নয়। আর কেমন করেই বা সম্ভবপর হবে। এক ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষা পাঠ করেছে, স্বাস্থ্য-রক্ষার সকল নিয়ামাবলি সে অবহিত, আর অবহিত বলেই সে সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে কিংবা সুস্বাদু আহারাদি সংস্থানের সংশ্লিষ্ট কৌশলাদি শিখেছে বলেই কারো ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে গেছে, এমনটি তো কখনও দেখা যায় নি। মাদকতা ও উন্মাদনার জ্ঞান ও এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুরোপুরি স্বতন্ত্র ও পৃথক বস্তু। এমনও অনেক ডাক্তার ও চিকিৎসাবিদ রয়েছেন যারা চিকিৎসায় একদম পটু, ওষুধ ব্যবস্থা ভাল জানে, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও নিজ স্বাস্থের ব্যাপারে সে খুব ভাগ্যবান নয়। মোটকথা,

নীতিজ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা এক বস্তু নয়। অতএব নিছক অধ্যয়নলব্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আর এর সাধনার আত্মনিবিষ্ট এবং এর সক্রিয় ও বাস্তব অভিজ্ঞতা মণ্ডিত, মহাজন, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় পরস্পর সমান নয়।

এ বিরাট পার্থক্য জ্ঞান উপলব্ধির পর থেকে আমি সুফিদের সান্নিধ্যে আসতে অভ্যাস করি। তাঁদের সাথে উঠা বসার মাধ্যমে আমি উপলব্ধি করেছি যে, তাঁরা কথায় পণ্ডিত নন, কাজের মহাপুরুষ। আমি এও বুঝেছি যে, জানাশোনা যথেষ্ট থাকলেও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রচুর অভাব রয়েছে।

শরীয়ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শাস্ত্রাদির আলোচনা এবং দীন ও দর্শনের নানান পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা ইতঃপূর্বেই আমি বুঝেছি যে, আল্লাহ নবুয়াত এবং শেষ দিবস, এই তিনটি বস্তর ওপর অচল, অটল এবং সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বাবস্থায়ই অপরিহার্য কর্তব্য।

ইমানের উক্ত তিনটি স্তম্ভ তথা ভিত্তি আমার অন্তরপটে ইতঃপূর্বেই স্থাপিত ছিল। অবশ্য নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিকে নয় বরং বহুমুখী নিদর্শন ও অভিজ্ঞতার দরুন এদের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়।

তাকওয়াতে আত্মবুদ্ধি ব্যতীত পরকালের সৌভাগ্য লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এ সত্যটি আজ আমার নিকট অতি স্পষ্ট। কিন্তু তাকওয়া কাকে বলে? তাকওয়া অর্থ অন্তরকে সকল জাগতিক মোহ থেকে মুক্ত রাখা এবং এ নশ্বর পৃথিবীর সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করে স্থায়ী গন্তব্যস্থলের জন্য প্রস্তুত হওয়া। শুধু তাই নয়, পুরোপুরি নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার সাথে আল্লাহের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তবে এ স্তরে পৌঁছা সহজসাধ্য নয়। এজন্য সুখ ও সমৃদ্ধিকে ত্যাগ করতে হয়, মুছে ফেলতে হয় মন থেকে ধন সম্পদের মায়া, মুছে ফেলতে হয় অন্তর থেকে সকল পার্থিব মোহ ও মাৎসর্য।

অতঃপর উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় আত্মার বিশ্লেষণান্তে প্রমাণিত হলো যে, নানাবিধ পার্থিব বন্ধনে সবিশেষে আবদ্ধ রয়েছি। নিজ কার্যক্রম সম্পর্কে ভেবেছি। উপলব্ধি হলো, এ সম্বন্ধে আমার পড়ালেখা অনুপাতে ভাল হলেও এটা যথোচিৎ বা যথেষ্ট নয়। কেননা বর্তমানে আমি যে জ্ঞানের চর্চা করছি তা পরকালে আমার কোন কাজে আসবে না।

অবশেষে এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যের পরখ করে দেখলাম তা-ও খাঁটি ও স্বচ্ছ নয়। অনুভূত হলে– এ সাধনার উদ্দেশ্যে খোদার সন্তুষ্টি বিধান নয়। বরং পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জনের প্রবণতা এবং সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জনের মোহ-মায়াই হলো এর মৌলিক প্রেরণা-উৎস। এই উপলব্ধির সাথে সাথেই দিব্যদৃষ্টি খুলে যায় এবং নিজেকে নরক তীরে দণ্ডায়মান অবস্থায় বোধ হয়। কার্যকর প্রচেষ্টার সাহায্যে অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নতি বিধানের আশু ব্যবস্থা না হলে এতে পতন সুনিশ্চিত।

নিজের এ দুরবস্থা ও অধঃপতনের কথা ভেবে মর্মাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই এবং এ অবস্থায়ই কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় আত্মসংরক্ষণের ক্ষমতা যদিও লুপ্ত হয় নি কিন্তু কোন বিষয়ে অনুসিদ্ধান্ত করার মতো দৃঢ়তা আমার ছিল না। সময়ান্তরে ভাবতাম বাগদাদ ত্যাগ করি, সুখ সমৃদ্ধির এ সব পরিবেশের অগোচরে লুকিয়ে যাই। তবে ক্ষণে ক্ষণে বহু বাধার সৃষ্টি হতো, এক পদ আগ্রগামী হলে অপরটি পশ্চাদ্‌মুখী হয়ে উঠতো। প্রাতে পরকালের একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসায় উদ্দীপিত হলেও কাম-সৈন্যবাহিনী বিকেলে এসে এদের পরাজিত করে দিত। ফলে শিথিল হয়ে যেত আমার মনোবল ও দৃঢ়তা। একদিকে পার্থিব মোহ বাগদাদ অবস্থানে বাধ্য করছে। অন্যদিকে পরকালের আহ্বানকারী সমস্বরে শুধাচ্ছে অবশিষ্ট জীবনাকার অতি সংকীর্ণ, আগামী ভ্রমণ অতি সুদীর্ঘ এবং জ্ঞান ও কর্মের যে পুঁজি নিয়ে তুমি আত্ম-প্রশান্তি বোধ করছ তা লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা মাত্র। সুতরাং এখনও মুক্তি বিধান করা না হয়, তাহলে সে সুযোগ আর কখনও মিলবে না। মনের গহ্বরে যখন এ সব চিন্তার উদ্রেক হতো তখন মন চাইত বাগদাদ ছেড়ে দূরে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যাই। তবে তৎক্ষণাৎই শয়তান এসে ছল করে বলে এই চাঞ্চল্য একদম সাময়িক, কখনও এর প্রশ্রয় দেবে না। কোনরূপ অন্যায় না করেই তো আপাতত এ সব পাওয়া যাচ্ছে, আর এতে না তোমার কোন দুশমন আছে, না অংশীদার। কিন্তু এ সাময়িক চাঞ্চল্যের বশবর্তী তোমার মন স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, কিন্তু তখন আর স্বাচ্ছন্দ্যের পুনর্প্রাপ্তি সম্ভব হবে না।

পূর্ববতী দৃঢ়তা ও অনিশ্চয়তা এবং সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় সুদীর্ঘ ছ'মাস পেরিয়ে যায়। একদিকে পরপারের স্মারকগুলো আমাকে বাগদাদ ত্যাগের প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগায় অপর দিকে পার্থিক ভোগ-লালসা সেখানে বাধা সৃষ্টি করে। এ সময়ই আমার অদৃশ্য সাহায্যে অর্জন হয়। আমি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি অর্থাৎ অকস্মাৎ আমার বাক শক্তি রহিত হয়ে যায়। আমি পঠন পাঠনব্রত অর্জন করতে বাধ্য হই। তবে আমর নিকট বিদ্যার্থীদের গমনাগমন যথারীতি চালু ছিল। আমারও মন চাইত তাদের পড়িয়ে সন্তুষ্ট করি। তবে কী করি, বাকশক্তি সম্পূর্ণ রহিত করার গভীরভাবে চিন্তাচ্ছন্ন, পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ, পরিপাক সম্পূর্ণ শিথিল। খাদ্য আদৌ হজম হয় না। এক ঢোক পানি পানেরও সাধ্য নেই। মোদ্দাকথা, ইন্দ্রিয়গুলো সবই বিকল হয়ে পড়েছিল। এর প্রতিকারে চিকিৎসকদের চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। তাঁরা চিকিৎসা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বলেন যে এ দৈহিক রোগ নয়, বরং প্রথম তার মনে কোন আঘাত লেগেছে এবং পরে এটা ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্কে আক্রমণ করেছে। সে আঘাতের প্রতিকার ও মনের প্রশান্তি না হওয়া অবধি অন্যান্য ব্যাধির প্রতিকার সম্ভব নয়।

যখন অমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে আমার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রহিত আর আমি কারো হাতের পুতুল মাত্র। এমতাবস্থায় আমি যে, মহান সত্তা অসহায়দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন, তার দরবারে অসহায় ও কাতর স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর পরিচয়ই তো এই অথবা তিনি যিনি অসহায়দের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন।

কাজেই পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মায়াজাল ছিন্ন করা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়। আমার প্রস্তুতি দেখেই লোকজন বুঝেছিল যে, মক্কা শরীফ সফরে যাব। তবে আমর মতলব ছিল ভিন্ন। স্থির করেছিলাম সিরিয়া গিয়ে বসবাস করব এবং ভবিষ্যতে কোন দিনও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নাম উচ্চারণ করব না। আমি গোপনে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কারণ, খলিফা ও তাঁর সভাসদগণ এবং বন্ধুমহল জানতে পারলে আমার ইচ্ছা ভণ্ডুল হতে পারে। ইরাকি ওলামা সমাজ আমার এ সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। এ সুখসমৃদ্ধি পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তারা আমাকে

ভর্ৎসনা করেন। যে ধরনের পঠন-পাঠনে আমি নিযুক্ত ছিলাম, তাদের মতে, এসব পরিত্যাগ করা দীনের সেবা বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তাদর মতে এসব সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই ছিল তাদের সাধারণত ধারণা।

আমার এ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে জনগণের মনে বহু সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ইরাকিরা মনে করেছিল আমার উদ্যোগের পেছনে সরকারি ইঙ্গিত রয়েছে। আমার ব্যাপারে সরকার সদয়ভাব, অপর পক্ষ এর প্রতি আমার আনমনা ভাব দেখে সরকারের ঘনিষ্ঠ মহল বলতে বাধ্য হয়েছে যে, এ নৈসর্গিক ব্যবস্থা এর একমাত্র কারণ, মুসলমান ও সুধীমহলের অশুভ দৃষ্টি।

অবশেষে স্বীয় সন্তানাদির জন্য যথা প্রয়োজন রেখে অবশিষ্ট সকল সম্পদ আল্লাহর নামে দান করে দিলাম এবং সিরিয়ার উদ্দেশ্যে বাগদাদ ছেড়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমাকে দু'বছর অবস্থান করতে হয়। এ সময় নির্জন ও নিভৃতে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনাই ছিল আমার দিবস-রজনীয় একমাত্র ব্রত। উদ্দেশ্যে ছিল, পবিত্রাত্মারূপ নেয়ামত অর্জন করব, সুন্দর চরিত্র গঠন করব আর অন্তরকে একাগ্র করে গড়ে তুলব আল্লাহের স্মরণে। আধ্যাত্মিক সাধনার এ ধরনটি আমি সুফিদের নিকট থেকে আয়ত্ত করেছিলাম। দামেশকের মসজিদের রুদ্ধদ্বার মিনারা কক্ষে আল্লাহের স্মরণ ও ধ্যানে দিবারাত্র নিমগ্ন থাকাই ছিল সেখানে আমার প্রাত্যহিত কার্যক্রম। কিছুদিন পর সেখান থেকে আমি বায়তুল মুকাদ্দাস চলে যাই এবং প্রত্যহ মাকামে জামরায় গিয়ে ইবাদত করতে থাকি।

ইতোমধ্যে হজ সমাপ্ত করে, মক্কা মদিনার সুখ-সম্পদ লাভ এবং হজরত ইবরাহীম (আ) এর জন্মভূমি হয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাজার জিয়ারতের জন্য মন উতলা হয়ে ওঠে। যেমনি বাসনা তেমনি সাধনা। আমি হেজাজের অভিমুখে রওয়ানা হলাম।

হজপর্ব সমাপনান্তে সন্তান প্রীতি আমাকে আকৃষ্ট করে এবং আমার হৃদয়ে মাতৃভূমির স্মৃতি জাগরুক হয়। অবশেষে পুনরায় আমাকে মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে হলো। তবে দেশে এ সে-ও নিভৃত ও নির্জন সাধনার অভ্যাস বর্জন করি নি। বহু রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আত্মার পবিত্রতা অর্জনের

প্রয়োজনে এ অভ্যাস আমাকে বহাল রাখতে হয়েছে। যে কোন মূল্যেই আমি আল্লাহের বহাল রাখতে হয়েছে। যে কোনভাবেই আমি আল্লাহের স্মরণ ও ধ্যান এবং আমার নিভৃত জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে ত্রুটি করি নি। কখনো কখনো কালো দুর্যোগ, আর্থিক অভাব আমার ধ্যানকে বিঘ্নিত করত এবং আচ্ছন্ন করে দিত আমার নিভৃতের সুখ-শান্তি। তা হলেও আমি এতেই মগ্ন থাকতাম।

অনুরূপ আকর্ষণ বিকর্ষণ, নিভৃত সাধনা এবং অনুধ্যানের মধ্যে দিয়ে আমার সুদীর্ঘ দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই সময় কয়েকটি বিষয়ে আমার বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয়। তন্মধ্যে যে সব বিষয় সাধারণের জন্য কল্যাণকর ও উপকারী সেগুলো এখানে আলোচনার আশা রাখি।

এ দশ বছর কৃচ্ছ্র সাধনের সাহায্যে আমি সন্দেহাতীত ভাবে এ সত্যটি উপলব্ধি করেছি, যে সুফিমণ্ডলীই আল্লাহর একনিষ্ঠ সাধক, তাঁদের নৈতিক চরিত্র মানবকুল শ্রেষ্ঠ, জীবনধারা খুবই স্বচ্ছ এবং তারা নিখুঁত ও উন্নততর নৈতিকতার অধিকারী। তাঁদের নৈতিকতা ও চরিত্র এতই বলিষ্ঠ ও উচ্চমানের যে, সকল দর্শন বিজ্ঞান ও শরীয়তবেত্তাদের যাবতীয় জ্ঞান গরিমার সমন্বয় করেও এর মোকাবেলা করা যাবে না, তদ্রূপ বলিষ্ঠ চরিত্র কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হবে না। কারণ, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক নির্বিশেষে তাঁদের সকল কাজ নূরে নবুয়তের দ্বারা স্নাত। এ নূরে নবুয়তকে বাদ দিলে আর কী আছে যদ্দ্বারা আসল সত্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? যে চরিত্রের প্রধান কথাই হলো সব কিছু থেকে মোহমুক্ত হয়ে শুধু আল্লাহের ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে, শুধু তাই নয়, পরম আত্মার সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াতেই চরিত্রের সূচনা এবং সমাপ্তি সে চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে দ্বিমতের সুযোগ কোথায়?

ফানাফিল্লাহ

ফানাফিল্লাহ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ স্তর সন্দেহ নেই। অবশ্য তা কৃচ্ছ্র সাধনের পরিণতির দিক থেকে। অন্যথায় এটাই আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান। এর আগে যা কিছু করা হয়, সবই এর প্রস্তুতির পর্ব হিসেবে গণ্য। ফানাফিল্লাহ থেকে দিব্যজ্ঞান ও দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে।

সুফিগণ এ সোপানে অনুপ্রবেশ করেই ধ্যানের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবিদের আত্মার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন, তাদের কথা শোনেন এবং তাঁদের সাহায্যে আসল জ্ঞান-আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পান। শুধু তাই নয়, তাঁদের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সৃষ্টি ও বস্তুজগতের উর্দ্ধে তাঁরা এমন একটি ভুবনের সন্ধান লাভ করেন যার অবস্থা ও প্রভাব ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা বর্ণনার চেষ্টা করলে ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়ে উপায় নেই। তা ছাড়া সান্নিধ্য ও মিলনের বর্ণনা ভঙ্গি বিশেষজ্ঞদের একান্ত নিজস্ব। কেউ কেউ ফানাফিল্লাহকে পরমাত্মার রাজ্যে আত্মার প্রবেশ বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কেউ বলেন এর অর্থ, আত্মার প্রবেশ বলে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন এর অর্থ, আত্মার সাথে পরমাত্মায় মিলন। আর কারো মতে এ হলো, আত্মার পরমাত্মায় উপনীত হওয়া। প্রকৃতপক্ষে এ মতবাদগুলো গবেষণা করেছি। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা এই যে, যারা এসব গূঢ় রহস্যের সাথে পরিচিত হয়েছেন, তাদের এই অধিক কিছুই বলা উচিত নয় যে, যা হওয়ার তা-ই হয়েছে, বর্ণনা করার নয়। এতটুকুই জেনে রাখা ভাল যে, ভালই হয়েছে, এর বেশি অনুসন্ধান করে কোন উপকার হবে না।

মোটকথা, যে ব্যক্তি তাসাওফের আলো লাভ করে নি সে নবুয়তের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। নবিদের উপদেশই অলিদের কেরামত। হজরত রসূল মকবুল ﷺ যখন হেরা গুহায় আল্লহের ধ্যানে মগ্ন তখনই তাঁর কেরামত প্রকাশ পায়। কাজেই আরবদের বলতে হলো যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন।

এ পথের অনুগামী যে কোন ব্যক্তিই এ অবস্থাকে বুঝতে সক্ষম হন। যার এ ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, সে-ও এটা বুঝতে পারে যদি সে সুফিদের সাথে বেশি উঠাবসার দ্বারা তাঁদের অবস্থা ও নিদর্শনাবলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। যারাই তাদের সংস্পর্শে যাবে এবং এদের সাথে ভালবাসা রাখবে তারা কখনই ঈমানরূপ সম্পদ হতে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তাঁদের কোন সাথিই এ ব্যাপারে ভাগ্যাহত নয়।

সুফিতত্ত্ব সম্পর্কে যাদের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, তারা যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তা জানতে পারে। এহইয়াউল উলুম গ্রন্থের আজায়েবুল কালব অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করেছি।

যুক্তি-প্রমাণভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত জ্ঞান। এ অনুসিদ্ধান্তগুলো প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং শ্রবণ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে উপলব্ধি করার নাম ঈমান। এ হলো জ্ঞানের তিনটি স্তর। নিম্ন আয়াতে এর সমর্থন দেখা যায়। আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার মুমেন ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

এরা ব্যতীত সবই গণ্ডমূর্খ। মূর্খরাই সুফিদের বিবৃত তত্ত্ব ও তথ্যকে অস্বীকার করে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা তোমাদের কথা বলে, দেখুন তাঁরা আজ কী বলছে। এরাই সে সকল লোক আল্লাহ যাদের অন্তর মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তারা নিজ প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত। অতএব আল্লাহ তাদের বধির ও অন্ধকরে দিয়েছেন।

সুফিদের সাথে মেলামেশায় দরুন আমি যে কয়টি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি তন্মধ্যে নবুয়ত প্রধান। নবুয়তের জ্ঞানের উৎস কী, তা প্রত্যেকেরই জানা প্রয়োজন। অতএব পরবর্তী পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

নবুয়তের তাৎপর্য

সৃষ্টির আদি-মানবসত্তার অবস্থা ছিল খুবই নিরীহ। আশপাশের রূপ ও গন্ধময় সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে কারো কোনা জ্ঞানই ছিল না। আল্লাহ ব্যতীত তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংবাদ কেউ জানে না। (কুরআন) মানুষ ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে।এ জন্য ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে বিশ্বজগৎ অর্থ যাবতীয় সৃষ্টিজগৎ।

মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। সাহায্যে ঠাণ্ডা গরম অনুভূত হয়, শীতলতা ও শুষ্কতার প্রভেদ বুঝা যায় এবং উপলব্ধি করা যায় কোন বস্তুটি নরম ও মোলায়েম, আর কোনটি কঠিন শক্ত। অবশ্য এর শক্তি সীমিত। রঙ ও আওয়াজ সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করা এর ক্ষমতার বাইরে। বলা যায় যে, স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের কাছে সুর ও রঙ-এর অস্তিত্বই নেই।

অতঃপর এর অভাব পূরণের নিমিত্ত দর্শন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। অনুপাতে এর শক্তি প্রবল। এর সাহায্যে মানুষ রঙ্গ রূপ এবং ছবি দৃশ্যাবলি সম্বন্ধে জানতে শুরু করে।

এরপর শ্রবণ ইন্দ্রিয় অস্তিত্ব লাভ করে এবং এর দ্বারা মানুষ সুর ও স্বরের তাল বা ছন্দ সম্বন্ধে অবহিত হয়।

অতঃপর আস্বাদন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। এর পর বুদ্ধি ও জ্ঞানের অন্যান্য উৎসদ্বার খুলে যায়। ফলে শিশুর বিবেকি বয়সের কোঠায় অনুপ্রবেশ করে। যে কোন শিশুর ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকে এটা ঘটে। এ একটি অনুভূতি। যে সকল বস্তু ইতঃপূর্বে কখনও অনুভূত হয় নি, এর সহায়তায় মানুষ তা উপলব্ধি করে। এরপর তার মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে।

এর দ্বারা মানুষ ফরজ, হারাম, মোবাহ এবং হালাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং আর এমন অনেক বিষয়ে সে জ্ঞান লাভ করে, যার সম্পর্কে তার অতীতে কোন ধারণাই ছিল না।

বুদ্ধির অতীত উপলব্ধির আরো একটি মার্গ (স্তর) রয়েছে। আল্লাহর নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিগণ তা লাভ করে থাকেন। এ মার্গে জ্ঞানের একটি নতুন দৃষ্টি উন্মেলিত হয়। এর দ্বারা মানুষ অদৃশ্যের সন্ধান লাভ করে, ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত হয় এবং বুদ্ধির অতীত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। বিবেকি বয়সে বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয় না এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বিবেকগ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারে না! তদ্রূপ বুদ্ধিজগতে আবদ্ধ ব্যক্তি নবুয়তে মহত্ব উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অপারগ। ছয় বছরের শিশুর ব্যাপারে বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুবাদী না বুঝা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বহু জ্ঞানীয় পক্ষে নবুয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি না থাকা সম্ভব। নিজে জানে না বলে কোন কিছুকে অস্বীকার করা মূর্খতা। যে জন্মান্ধ নিজের উপলব্ধির অতীত বলে রঙ ও দৃশ্যে বিভিন্নতাকে অস্বীকার করে, এরা তারই রায়। এরা তো এটা অস্বীকার করবেই। অন্য কোনা নির্ভরযোগ্য ও বোধগম্য উপায়ে তাদের এগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান না করা হলে, এগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা করা এদের পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব।

নবুয়তের প্রকৃতি কী? নবুয়ত সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে মানুষ কিভাবে অবহিত হতে পারে? ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুসমূহকে স্বপ্নের সাথে তুলনা করে বুঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। এটা আল্লাহের অপার অনুগ্রহ। স্বয়ং মানুষের মধ্যে তিনি নবুয়তের তাৎপর্য ও স্বরূপ প্রকৃতি উপলব্ধির সহায়তা দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা মানুষ আলোচ্য বিষয়ে কিছুটা অবহিত হতে পারে এবং স্পষ্টভাবে জানতে সক্ষম হয় যে, ইন্দ্রিয়ের উর্ধেও চিন্তা ও অবগতির একাধিক স্তর ও মার্গ রয়েছে। স্বপ্নের মাধ্যমে রূপকের সাহায্যে মানুষ অনুষ্ঠিতব্য ঘটনা স্পষ্ট দেখতে পায়। ব্যাখ্যার দ্বারা রূপকেরও গূঢ় অর্থ উদ্ধার করা হয়। স্বপ্ন সম্বন্ধে মানুষের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও এ কথা বুঝান খুবই কঠিন ছিল যে, একজন অচেতন ব্যক্তি যার শ্রবণ ও দর্শন শক্তি রহিত এবং বুদ্ধিবৃত্তি সজীব নয় তার ব্যাপারে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে যে তা কি করে সম্ভব? উপলব্ধি করা সম্ভবপর? ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়েও যে, অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয় না, অচেতন অবস্থায় তা জানতে পারার প্রশ্নই তো উঠে না।

এ যুক্তিটি এমন যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সমর্থন করে না। আমরা বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে মনে করি। কেননা এ সাহায্যে এমন বহু রহস্য জানা যায়, শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা আদৌ জানা সম্ভব নয়। অপুরূপ নবুয়ত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়ের ঊর্ধ্বের বিশেষ প্রকৃতির একটি জ্ঞান উৎস। নবুয়ত লাভের পর নবিগণ একটি বিশেষ জ্ঞান দৃষ্টির অধিকারী হন। এর সাহায্যে তাঁরা অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অবহিত হন। তা ছাড়া বুদ্ধিরও ঊর্ধ্বে, এমন অনেক বস্তুর নিশ্চিত জ্ঞান তাঁরা লাভ করেন।

নবুয়ত সম্পর্কে অনেকে বিভিন্ন রকম সন্দেহ করে। কেউ এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ করে। কারো সন্দেহ এর বর্তমান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। আবার কেউ বলছে যে, বর্তমানে এর দরকার থাকলেও কোন বির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নবি বলে স্বীকার করার কোন দরকার আছে কি? এর সবাই নবুয়তের প্রত্যাখ্যানকারীর দলভুক্ত।

নবুয়তের সম্ভাব্যতা স্বম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। স্বয়ং এর অস্তিত্বই এর সম্ভাব্যতার নির্জলা সাক্ষ্য। এর অস্তিত্বের প্রমাণ কী? আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে, এলহাম ও ওহির মাধ্যম ছাড়া যেগুলো লাভ করা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা বলা যেতে পারে। প্রাথমিক আমলে জ্যোতির্বিদ্যা ও কোন কোন ওষুধের গুণাগুণ এলহামের দ্বারা জানা যেত। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, অগণিত অতীত অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ নিজেই বুদ্ধি ও জ্ঞানের উক্ত স্তরে পৌঁছেছে, একথা মনে করায় আপত্তি কী? জবাব এই যে, এটা সম্ভব নয়। কারণ এমন অনেক তারকা রয়েছে, হাজার বছর অন্তর যেগুলোর অবস্থার রূপান্তর ঘটে। তদ্রূপ অবস্থায় কারো পক্ষে সম্ভব যে হাজার বছর জীবিত থেকে এদের গবেষণা করবে আর এর ফলাফল পরবর্তীদের জন্য লিপিবদ্ধ করে যাবে/ হাজার হাজার বছর অবধি মানুষ ওষুধের যে গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কেও একথা প্রযাজ্য।

অতএব প্রমাণিত হলো যে বুদ্ধির ঊর্ধ্বেও জ্ঞানের একটি উৎস আছে। আমাদের মতে এটাই নবুয়ত। আলোচ্য জ্ঞান বিজ্ঞান নবুয়তের অন্যতম

দান। এর ছাড়া নবুয়তের আরো বহু বৈশিষ্ট ও উপকারিতা আছে। এত মহাসাগরের এক বিন্দুমাত্র! নবুয়তের অন্যতম সদৃশ বস্তু স্বপ্ন সম্বন্ধে তোমাদের অভিজ্ঞতা আছে, অনুরূপ কিছু কিছু জ্ঞান-উৎসের সাথেও তোমরা পরিচিত। ফলে এখানে আলোচনা দীর্ঘায়িত করলাম না। স্মরণীয় যে, বুদ্ধিই যদি জ্ঞানের শেষ উৎস হতো, তাহলে উক্তরূপ অনেক বিষয় আমরা জানতে পারতাম না। পূর্ববতী নবিদের ওসিলায় আমর এসব অমূল্য জ্ঞান সম্ভার উপহার পেয়েছি।

এ ছাড়া নবুয়তের অনেক বৈশিষ্ট আছে। শুধু তাসাওফের অনুশীলন দ্বারাই সেগুলো উপলব্ধি করা যেতে পারে। স্বপ্নের আলোকে আমরা নবুয়তের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে পারলাম। স্বপ্নের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলে নবুয়তের বিধান মেনে নেওয়া আমার জন্য কঠিন ছিল। কেননা নবুয়তের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা জন্মার মতো কোন দৃষ্টান্ত বর্তমান না থাকলে বিশ্বাস তো পরের কথা সাধারণ মানুষের জন্য এর তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কারণ বিশ্বাসের পূর্ব শর্ত হলো জ্ঞান। এর দৃষ্টান্ত বুঝার জন্য কোন সাধনার দরকার নেই। উৎস অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়েই এ জ্ঞান অর্জন হয়। ফলে সাধক কে রকম অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং নবুয়তের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্যের প্রতি তার বিশ্বাস জন্মে এতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বুদ্ধি ও অনুমানের সাহায্যে তা সম্ভব নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থপনের লক্ষ্যে এতটুকু জ্ঞান যথেষ্ট।

কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি সন্দেহ হয় যে বাস্তবিক সে নবি কিনা, তবে তার জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। সে যদি জীবিত থাকে তবে চাক্ষুস দেখেই তা করা যায়। অন্যথায় কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তা জানা যেতে পারে। চিকিৎসা ও ফিকাহ্‌শাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে এর আলোকে তাদের অবস্থা দেখে বা শুনে কে ডাক্তার আর কে ফিকাহবিদ তা ঠিক করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। জীবন ইতিহাস পর্যালোচনার দ্বারা ইমাম

শাফী ও জালিয়ানুসের পরিচয় লাভ করা মোটেই কঠিন নয়। আপনি বিনা সংশয়ে বলতে পারেন যে, ইমাম শাফী ছিলেন ফিকাহবিদ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং তাকলিদের জ্ঞান এক নয়। চিকিৎসা শাস্ত্র ও ফিকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের দরুন আপনার মধ্যে উক্ত বিষয়বিদদের চেনার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

নবুয়তের ব্যাপারেও ঠিক তাই। আপনি যদি নবুয়তের তাৎপর্য এবং গূঢ় অর্থ ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কোরআন হাদীসের গবেষণা করেন, তবে হজরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, এসত্য উপলব্ধিতে আপনার কোনই কষ্ট হবে না। হজরতের কয়েকটি বাণীতেকে এ কথার সমর্থন লক্ষ করা যায়। বাণীগুলো নিরেট দার্শনিক। অভিজ্ঞতার দ্বারা এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

বাণীগুলো নিম্নরূপ:

ক. যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তাকে অনেক অজানা জিনিসের জ্ঞান প্রদান করেন।

খ. যে ব্যক্তি জালেমের সাহায্য করে আল্লাহ উক্ত জালেমকেই তার ওপর পরাক্রমশালী করে দেন।

গ. যে ব্যক্তি আল্লাহের চিন্তার মাধ্যমে প্রভাত উদ্‌যাপন করে পরলৌকিক সকল চিন্তা থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি প্রদান করেন।

একবার ভাবুন কথাগুলো কত সত্য। যে কোন পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করুন এগুলো সত্য হিসেবে প্রমাণিত হবে।

এ হলো নবুয়তের সত্যতা যাচাই ও তার প্রতি আস্থাশীল হওয়ার পদ্ধতি। লাঠির সাপ হওয়া বা চন্দ্রকে বিদীর্ণ করা নবুয়তের প্রমাণ নয়। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি হতে স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করলে এ সব মোজেযা দ্বারা সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তো হবেই না বরং সংশয়ের সৃষ্টি হবে। মনে হতে পারে এগুলো যাদু বা মতিভ্রম বলে। আবার মনে হতে পারে যে,

আল্লাহ লোকের ঈমান পরীক্ষার জন্য এ সব অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা প্রদর্শন করেছেন।

(আল-কোরআন)

মোজেযা সম্পর্কে আপনাদের মনে যত রকম প্রশ্নই উদয় হোক না কেন, আপনাদের ঈমান যদি বলিষ্ঠ ও উপযুক্ত প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সকল দ্বিধা আপনাতেই দূর হয়ে যাবে এবং ঈমান মজবুত হবে। অন্যথায় কঠিন বিপদ আছে।

সুতরাং মোজেযাই সব কিছু এরূপ বিশ্বাস করা উচিত নয়। বরং একে নবুয়তের অন্যতম প্রমাণ মনে করা উচিত। এ পদ্ধতিতে যে জ্ঞান লাভ হবে তা নিশ্চিত ও নির্ভুল হবে তাতে সন্দহ নেই। এ জ্ঞান একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হবে না। এ হলো নবুয়ত সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভের জ্ঞানগত পদ্ধতি। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতাবলব্ধ জ্ঞানকে চাক্ষুস বা বাস্তব জ্ঞান মনে করা যেতে পারে। তাসাওফের পদ্ধতি ব্যতীত আলোচ্য বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা এর প্রায়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করব।

আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান

সুফিব্রত অবলম্বনের পর আমি দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা, পর্যালোচনা পুরোপুরি পরিত্যাগ করে দিই। দশ বছর নির্জন জীবন যাপনের ফলে দর্শন বিজ্ঞানের কয়েকটি দিক সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। কখনো অভিজ্ঞতা আবার কখনো যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে এ জ্ঞান অর্জন হয়। কখনো শুধু আত্মসমর্পণের দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হতো। জানতে পারলাম যে, মানুষ কেবল বস্তু ও প্রকৃতির অপর নাম নয়, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ অস্তিত্ব অর্জন করেছে।

আত্মা কী? সকল জীবিত প্রাণীর মাঝে বর্তমান রক্ত-মাংসের টুকরোকে আত্মা বলে না। এ একটি বিশেষ আদেশের নাম। এটাই আধ্যাত্মজ্ঞানের উৎস। দেহের মতো আত্মারও রোগ এবং সুস্থতা আছে। সেই মুক্তি পাবে আল্লাহ যাকে সুস্থ আত্মা দান করেন। তাদের আত্মা রোগাক্রান্ত এ আয়াত হতে তা-ই বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা আত্মহত্যার নামান্তর। তাঁর অবাধ্যতা আত্মার রোগ বৃদ্ধি করে এবং তাঁর জ্ঞান ও আনুগত্য আত্মার রোগের প্রতিষেধক। দেহ যেমন ওষুধ ব্যতীত রোগমুক্ত হয় না সে রকম আত্মার রোগের মুক্তির জন্যও যথারীতি চিকিৎসা ও ওষুধ আবশ্যক।

বুদ্ধি থাকলেই যে কোন লোক ওষুধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বুঝতে সক্ষম হয় না। বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারই কেবল তা বুঝার শক্তি রাখে। অনুরূপভাবে আত্মার ওষুধরূপে ইবাদতের পরিমাণ ও পরিমাপের মাঝেও আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত রয়েছে। নবিগণ ছাড়া কেউই সে ব্যাপারে অবগত নন। নবির এ অবগতি নবুয়তেরই বদৌলতে জ্ঞান ও গবেষণার ফলে নয়। দশ বছরের সাধনার মধ্যে দিয়ে আমি আরো বুঝতে পেরেছি যে, বিভিন্ন অনুমান এবং রকমারি ওষুধের সমন্বয়ে একটি ব্যবস্থা প্রস্তুত এবং সংমিশ্রণ অমূলক নয়। আসলে রকমারী ওষুধ অনুসংমিশ্রণের মধ্যেই রোগের আরোগ্য ও মুক্তি নিহিত। তেমনি আত্মার ওষুধরূপে ইবাদতও বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন, নামাযের মধ্যে সেজদার সংখ্যা বেশি রুকুর সংখ্যা কম কিংবা ফজরের ওয়াক্তে ফরজ নামায দু'রাকাত এবং আসরের ওয়াক্তে ফরজ চার রাকাত। এ বিভিন্নতার মধ্যেও আল্লাহ অনেক রহস্য নিহিত রেখেছেন। শুধু নবুয়তের আলোর সাহায্যে সে রহস্য উদ্ঘাটন করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি নিছক অনুমানের দ্বারা ইবাদতের মধ্যকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং এদের কম-বেশি হওয়ার রহস্য বুঝার চেষ্টা করে এবং একে নিরর্থক বলে মনে করে, আমাদের মতে সে ব্যক্তি অকাট মূর্খ।

ওষুধও ইবাদতের মধ্যকার সাদৃশ্যের ব্যাপারে চিন্তা করুন। ওষুধের মধ্যে মৌলিক ও আনুষঙ্গিক এক রকম পদার্থ থাকে। তদ্রূপ ইবাদতের মধ্যে ফরজ ও ওয়াজিব, নফল এবং মোস্তাহাব বহু রকম অনুষ্ঠান রয়েছে। নফল মোস্তাহাব, ফরজ-ওয়াজিবের পরিপূরক। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, নবিগণ আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসক। বুদ্ধির দ্বারা আমরা এটুকু জানতে পারি, ব্যাধির চিকিৎসা করতে পারি না। বুদ্ধির কাজ হলো অন্ধের মতো আমাদের হাত ধরে নবুয়তের রহস্য সম্বন্ধে যারা অবগত আছেন, তাদের নিকট নিয়ে যাওয়া এবং আত্মিক রোগ বিশেষজ্ঞদের কাছ পৌঁছে দেওয়া। এ বুদ্ধিই তো দৈহিক রোগীকে তাঁর চিকিৎসকদের কাছে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। বুদ্ধির শক্তি এখানেই শেষ। জ্ঞান ও উপলব্ধি পরবর্তী স্তরে বুদ্ধির কোনই প্রবেশাধিকার নেই। বুদ্ধি সেখানে ব্যর্থ। এ হলো আমার দশ বছরের নির্জন সাধনালব্ধ জ্ঞান।

সন্দেহের কারণ

অতঃপর আমি ভাবলাম যে, নবুয়ত ও এর সত্যতার ব্যাপারে কেন সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং কর্তব্য পালনে মানুষের অলসতা ও সংকীর্ণতা কেন? আমি জানতে সক্ষম হলাম, এর মূল কারণ চারটি–

১. দর্শন ও বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপক চিন্তা গবেষণা।

২. তাসাওফের ভুল ব্যাখ্যা।

৩. তালিমিয়াদের (শিয়াদের) মতবাদ।

৪. আলেম সামাজের কার্যকলাপ।

ঈমানের দৌর্বল্য ও শৈথিল্যর মূল কারণ নির্ধারণের সাধনায় আমি অনেক দিন কাটিয়েছি। আমি অনেককে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেছি যে, শরীয়তের বিষয়ে তোমরা এত সন্দিহান কেন বা তোমরা এ ব্যাপারে কিরূপ সন্দেহ পোষণ কর? আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছি যে, প্রকৃতিই যদি তোমাদের পরকালের ব্যাপারে বিশ্বাস থাকে তাহলে এর জন্য তৈরি হচ্ছ না কেন তোমাদের স্পষ্ট নির্বুদ্ধিতা নয়? দুনিয়া তো তোমরা খুব ভাল বুঝ। দু' টাকার পরিবর্তে এক টাকা গ্রহণ করতে তোমরা প্রস্তুত নও। পরকালের ব্যাপারে এ বোকামী করছ কেন? তোমরা অনন্ত সম্পদকে সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে ত্যাগ করছ? এই যদি তোমাদের অবস্থা হয় তবে জেনে রেখ যে, দুর্ভাগ্যবশত তোমাদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তোমরা কট্টর কাফের। তোমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির চেষ্টা হওয়া উচিত। প্রকাশ্যে না বললেও অন্তত তোমাদের জানা কর্তব্য, তোমাদের এ অবস্থার কারণ কী।

আলেম সমাজের অবস্থা

এ জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমি একই প্রশ্নের বহু উত্তর পেয়েছি। কেউ বলেছে যে, শরীয়তের সংরক্ষণ যদি প্রয়োজনই হবে তবে আলেম সমাজকে আরও নিষ্ঠাবান হওয়া কর্তব্য। অমুক প্রখ্যাত আলেম নামাযই পড়ে না, অমুক বিরাট পণ্ডিত মদ্যপান করে, অমুক সাহেব অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন লিপ্ত, অমুকে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করেছে, অমুক বাদশাহের বৃত্তি ভোগ করছে কিংবা ঘুষ গ্রহণে কোন দ্বিধা করেছে না। অমুক অমুক অনাথদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করছে তারা আরো কত কি করছে। তদ্রূপ অমুক সাহেব নিজেকে সুফি বলে দাবি করেন এবং বলেছে, আমি আধ্যাত্মিকতার এমন স্তরে পৌঁছেছি যেখানে ইবাদত মোবাহ। অবশ্য এ সব কথা যারা বলে তারা পথভ্রষ্ট। এরা নিজেরা পথভ্রষ্ট আর অন্যদের পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। তালিমিয়া সম্পদায়ের কথা হলো সত্যের উপলব্ধি বর্তমানে অসম্ভব। সম্ভাব্য যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। দল ও মতের পার্থক্য এত প্রকট যে, এগুলোর সত্যাসত্য নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি প্রমাণাদির বৈপরীত্য এবং স্ববিরোধিতা খুবই প্রকট। অনুমান তো সম্পুর্ণ অগ্রাহ্য।

এমতাবস্থায় নিষ্কৃতি লাভের একটিই পথ রয়েছে– তা হলো শিক্ষাগুরুর স্বীকৃতি প্রদান করা। আপনিই বলুন নিশ্চিত হওয়ার উপায় থাকতে সন্দেহের মধ্যে কেন থাকব?

দর্শনের প্রতিক্রিয়া

কেউ কেউ আমাকে এ জবাব দিয়েছেন জনাব, আমাদের বর্তমান মত ও চিন্তাধারা তাকলিদভিত্তক নয়। চিন্তা ভাবনা করে আমরা এ মতবাদ গ্রহণ করেছি। দর্শনের গবেষণার সাহায্যে আমরা নবুয়তের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের মতে নবুয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞান ও কল্যাণের চাহিদাকে অক্ষুন্ন রাখা এবং তাদের প্রকৃতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। আমি মূর্খ নই। আমি দর্শন বিজ্ঞানকে ভালভাবে জানি এবং কল্যাণ ও বিজ্ঞানের উদ্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমি ওয়াকেফহাল। সুতরাং শরীয়তের বাধ্যতাকে আমি নিজের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপারে যারা গবেষণা করেছেন এবং ইবনে সিনা এবং ফারাবির মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা এবং মতবাদ জেনেছেন, এ হলো তাদের সর্বোচ্চ ঈমান। দৃশ্যত এরা মুসলমান। এদের মধ্যে কোরআন পাঠ করা, রীতিমত নামায পড়া, ইসলামী সমাবেশে অংশগ্রহণ করা এবং মুখে শরীয়তের প্রশংসা করার মতো লোক অনেক আছে। অন্যদিকে তারা মদ্যপান ও অন্যান্য পাপ কর্মে অভ্যস্ত। তাদের যদি বলা হয় যে, তোমাদের নবুয়তের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে নামায পড়ার দরকার কী? তখন তারা বলে যে, এতে কিছুটা শরীর চর্চা হয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে সমাজের লোকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা হয়। ফলে ধন-সম্পদ ও সন্তানগণ তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। কেউ হয়ত নবুয়ত ও শরীয়ত সত্য বলে স্বীকার করে। তাদের যদি বলা হয়, তবে মদ্যপান করছ কেন? তখন তারা বলে, মদ্যপান শুধু তখনই হারাম যখন কোন লোক তা পান করে হুঁশহারা হয়ে যায় এবং নৈতিক সীমা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আমাদের জন্য এ বৈধ। কেননা আমরা স্বীয় বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজন পরিমাণ পান করি। তা ছাড়া, এর একটা উপকারও আছে। তা এই যে, এর সেবনে বোধ ও চিন্তাশক্তি প্রবল হয়। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়ে।

ইবনে সিনার অসিয়ত

ইবনে সিনার প্রতি লক্ষ করা যাক। নিজ অসিয়তনামায় তিনি শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ করার অঙ্গীকার করলেও মদ্যপান পরিহার করতে প্রস্তুত নন। এ ব্যাপারে তাঁর চরম সংযম হলো যে, শুধু ভোগ বিলাসের জন্য তিনি মদ্যপান করেল না বরং, শুধু ওষুধ পরিমাণ পান করবেন। এ হলো এ ধরনের দার্শনিকদের ঈমান ও কাজ। শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েও তারা সকল অন্যায়ের উৎসকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। ফলে সরল প্রাণ মুসলমান তাদের অসৎ চিন্তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। আমাদের মতে জনগণ তাদের খপ্পড়ে পড়া আর ধোঁকা খাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ তাদের প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ তাদের চরিত্র, ঈমান ধর্ম বিশ্বাস সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো বিশ্লেষণের পরিবর্তে তাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্র এবং তর্কবিদ্যা প্রভৃতির বিরোধিতা করে। অথচ এ সবই প্রয়োজনীয় বিষয়।

যখন স্বচক্ষে এ অবস্থা দেখলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, এ সব কারণেই জনগণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তাদের ঈমানের মধ্যে ফাটল ধরেছে এবং কর্মপ্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন আমি এর সংস্কারের সংকল্প গ্রহণ করি। আমার মন ঐকান্তিকভাবে এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাদর বিশ্বাস ও কর্মের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে তেমন কঠিন কাজও ছিল না। কারণ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বিষয়গুলো ইতঃপূর্বেই আমি উত্তমরূপে পাঠ করেছিলাম। সুফিদের ব্যাপারে তো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই ছিল। তালিমিয়াদের মতবাদও আমার অজানা ছিল না। নামজাদা আলেমদের কার্যকলাপও আমার জানা ছিল না। আমার মনের ভিতর থেকে আহ্বান এলো, তৈরি হও, সৃষ্টির সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্বভার গ্রহণ করো, কতকাল একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবে? সারা বিশ্ব যখন বিভ্রান্তির পথে এবং চিকিৎসকরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তখনও কি জিকিরের মাঝে লিপ্ত থাকবে? মাঝে মাঝে ভাবতাম এ অন্ধকারে আলো জ্বালা সম্ভব হবে কি? ধর্মীয় শৈথিল্যকে যারা মোটেই দোষ মনে করে না, তারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দেবে কি? বরং আমার দুশমন হয়ে দাঁড়াবে এবং

পরিণামে আমাকে কষ্ট পেতে হবে। ফলে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। সংস্কার সাধন এবং পথ প্রদর্শন প্রচেষ্টার সাফল্যের ব্যাপারে দরকার অনুকূল সময় আর দীনদার প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অনুকূল সময় এবং প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় নীতিকে শক্তি প্রয়োগে কার্যকর করবে।

এ সব চিন্তা ভাবনা কর আল্লাহর কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করলাম এবং তর্ক-বিতর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাভূত করা যাবে না মনে করে নির্জন সাধনার পথ গ্রহণ করলাম। ইতোমধ্যে কোন বাহ্য কারণ ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাদশাহের মনে তালিমিয়াদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি নির্জনতা ত্যাগ করে নিশাপুর গিয়ে দুর্বল ঈমান লোকদের বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ অমান্য করা আমার পক্ষে অভদ্রতা হতো। আমি দেখলাম যে, এখন আপত্তি করা বা এড়িয়ে যাওয়ার সময় নয়। সংস্কারের প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে ধ্যানমগ্ন থাকা শুধু আরামপ্রিয়তার নামান্তর বলে বিবেচ্য। কাজেই জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে আমার অনর্থক লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বলা বাহুল্য এর কোনটাই শোভনীয় নয়। আবার আল্লাহর বাণীও রয়েছে তারা কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই পরীক্ষা না করে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, অথচ তাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদেরও আমি পরীক্ষা করেছি। আপনার পূর্ববর্তী নবিদেরও তো মিথ্যাবদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তারা সেই অপবাদ ও যাতনা সহ্য করেছেন, যতক্ষণ না আমাদের সাহায্য এসে পৌঁছেছে এবং আল্লাহর বাণী খণ্ডন করার ক্ষমতা কারো নেই এবং অন্যান্য নবিদের সংবাদ তো আপনি ইতোমধ্যেই জেনেছেন।

এতদসত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা আমি দরকার মনে করলাম। প্রত্যেকেই পরমর্শ দিলেন, নির্জনতা ত্যাগ করে সংস্কার ও হেদায়েতের কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ চায় তো এ প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। কেননা আল্লাহ নিজেই অঙ্গীকার করেছেন যে, যুগে যুগে তিনি তার দীনের

সংস্কার করবেন। আল্লাহর সে কাজ আপনার দ্বারা সুসম্পন্ন হতে পারে। এ সব পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং বাদশাহের আদেশ পালন করা উচিত বলে সিদ্ধান্ত করি। সুতরাং ৪৯৯ হিজরি জিলকদ মাসে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। উল্লেখযোগ্য যে, এ মাসেই আমি বাগদাদ ছেড়ে এসেছিলাম। অর্থাৎ ৪৮৮ হিজরি জিলকদ এ হিসাবে আমার নির্জন সাধনার মেয়াদ প্রায় এগারো বছর। আমার এরূপ নির্জন জীবন ত্যাগ করাও আল্লাহের কুদরতের খেলা। নতুবা কখনো এটা কল্পনা করি নি। এ ঘটনাও আমার বাগদাদ ত্যাগ ও অন্যান্য ঘটনার অনুরূপ। এ সময় ঐ সকল ঘটনা আমার মনেও আসে নি। সবই অন্তর্যামী এবং সর্বনিয়ন্তার কৃপা। তিনি আমার এ সিদ্ধান্ত এভাবে পরিবর্তন করান। আর কেন করবেন না? মুমিনের অন্তর আল্লাহের দু' অঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। (হাদীস)

উল্লেখ্য যে, যে ধরনের শিক্ষকতার ব্যস্ততায় বর্তমানে আত্মনিয়োগ করতে যাচ্ছি এবং যা আমি ইতঃপূর্বে ত্যাগ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ আলাদা, এটা আমি জানতাম। প্রথম যে জ্ঞান বা শিক্ষার প্রচার করতাম তা ছিল পার্থিব জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের উপকরণ বিশেষ। বর্তমানে যে শিক্ষা আমি দিতে যাচ্ছি তা মানুষকে শিক্ষা দেয় কিভাবে পদমর্যাদা ও আড়ম্বরের মোহ ত্যাগ করতে হয়।

আমি এ ব্যাপারে কৃতকার্য হব কিনা জানি না। তবে এটা জানি যে, সব কিছুই আল্লাহের ইচ্ছাধীন এবং এ উদ্যোগ আমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, তারই বিশেষ অনুগ্রহের ফল। আমি স্বেচ্ছায় দায়িত্বভার নিই নি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, তিনি আমার দ্বারা এ কাজ করাবেন। তাঁর নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, তিনি এ কাজে বর্ণনা আমার সহায় হোন এবং আমাকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন, যেন অন্যেরা পথের সন্ধান পায় এবং আমি সবসময় সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে অসত্য মনে করে তদানুযায়ী কাজ করতে পারি।

দুর্বল ঈমান ও এর অপকারিতা

ইতঃপূর্বে আমরা সাধারণ্যে ধর্মীয় প্রেরণায় শৈথিল্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা দুর্বল ঈমান লোকদের সৎপথে আনয়নের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করব। তালিমিয়াদের সংশোধন করার উপায় সম্পর্কে আমরা কিস্‌তাসুল মুস্তাকীম গ্রন্থে আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনরুল্লেখ আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করবে। যারা শরীয়তকে বৈধ মনে করে এবং নিজেদের শরীয়ত ও নৈতিকতার যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত বলে দাবি করে, তাদের যাবতীয় সন্দেহকে মোট সাত ভাগ করে ইতঃপূর্বে জবাব প্রদান করেছি। এ জন্যে আমার কিমিয়ায়ে সাআদাত দেখুন। অবশিষ্ট থাকে সে সব লোক দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাবে যাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে এবং যারা নবুয়তকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে। এদের ভ্রমমুক্তির জন্য নবুয়তের বিশদ ব্যাখ্যা করলাম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে এর যথার্থতা প্রমাণ করে দেখালাম। এজন্যই আমি প্রথমে এর আলোচনা করেছি এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান হতে এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছি। কারণ এটা তাদেরই গৃহীত প্রমাণ পদ্ধতি। আবার প্রতিপক্ষের বক্তব্য থেকে যুক্তি প্রমাণ দিয়ে কথা বলা আমার অভ্যাস।

আবার আরো একটি সম্প্রদায় রয়েছে। এরা মুখে নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কিন্তু তারা শরীয়ত ও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে বিচার করে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে। নিঃসন্দেহে এরাও ধর্মদ্রোহী। তারা দীন বা মাজহাব নয় বরং নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী। স্বীয় প্রবৃত্তির তাগিদেই তারা নবুয়তের পবির্তে বিজ্ঞানের অনুসরণ করে চলে।

নবুয়ত ও বুদ্ধি

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নবুয়তের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, নবুয়তের স্বীকৃতির অর্থই হচ্ছে, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে যথেষ্ট না জানা এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অতীত আধ্যাত্মজ্ঞানের স্তরকে স্বীকার করা। সেখানে সত্য-সাধক নবদৃষ্টি লাভ করে। এ দৃষ্টি দিয়ে সে এমন অনেক বিষয়ে অবগত হয়, যা বুদ্ধির নাগালের বাইরে। শ্রবণেন্দ্রিয় যেরূপ রঙের উপলব্ধি করতে অপারগ অথচ দর্শনেন্দ্রিয় সুরের উপলব্ধি করতে অক্ষম বা সকল ইন্দ্রিয় মিলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুর ব্যাপারে কোনরূপ ধারণা করতে পারে না, অনুরূপভাবে বুদ্ধি ও এর ঊর্ধ্বে অধ্যাত্মজ্ঞানের স্তরে পৌঁছতে পারে না।

অতঃপর ইন্দ্রিয় বুদ্ধির ঊর্ধ্বের আধ্যাত্মজ্ঞানের এ স্তরকে অস্বীকার করতে চান, করুন। আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি। এরস সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা এবং এর অস্তিত্ব আমি প্রমাণ করে দিয়েছি। তাতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ বুদ্ধির অতীত বস্তুরাজির আস্তিত্বকে স্বীকার করা।

উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যেতে পারে। যে কোন মানুষের জীবননাশের জন্য এক তোলা আফিম যথেষ্ট। কারণ, এ অতি শীতল। তা সেবনে শরীরের রক্ত জমে গিয়ে তার চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানে যে, মাটি ও পানি, এ দুটি পদার্থই শীতলতা সৃষ্টি করতে পারে। এও সবাই জানে যে, কয়েক সের পানি ও মাটি একত্রিত করলেও এক তোলা আফিমের সমান শীতলতা সৃষ্টি হবে না। এখন ধরুন জনৈক পদার্থ বিজ্ঞানী তিনি আফিমের উক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন, তাকে যদি আফিমের এ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় তবে কি সে বলবে যে এটা সত্য নয়। কেননা, এতে অগ্নি ও বায়ুর ন্যায় গরম পদার্থও রয়েছে। অতএব এ এত শীতল হতে পারে না।

উক্ত উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করুন, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের যুক্তি প্রমাণ এরূপ নয় কি? যে কোন বস্তু তারা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের

সীমাবদ্ধ অনুভূতিতে বিচার করতে প্রবৃত্ত হয় এবং যা কিছু এর আওতায় আসে না, অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করে।

স্বপ্ন সম্পর্কেও ঠিক একই কথা খাটে। খাঁটি স্বপ্ন দেখার অভজ্ঞতা যদি মানুষের না থাকত এবং কেউ দাবি করত যে, কোন বিশেষ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলো যখন নিষ্ক্রিয় থাকে এবং চিন্তা ও উপলব্ধি বাহ্যত বিকল হয়ে পড়ে তখন তার অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হয় এবং সে অদৃশ্য সম্বন্ধে জানতে পারে তা হলে অপক্ব জ্ঞান দার্শনিকগণ রহস্য করত। কারণ ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন জ্ঞানের উৎস তার স্বীকার করে না। তদ্রূপ অগ্নিক্রিয়ার সাথে যদি মানুষের পূর্ব পরিচয় না থাকত এবং কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের বলতো যে, পৃথবীতে একটি অদ্ভুত পদার্থ রয়েছে, এর বিন্দুমাত্র একটি পুরো শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই অঙ্গার করার জন্য যথেষ্ট, তা হলে তাকে বিশ্বাস করত না।

এখানে অপর পক্ষের পণ্ডিতদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য যে, বিশ্লেষণযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আফিমের অসাধারণ শীতলতার কথা স্বীকার করছ, তবে শরীয়ত ও ধর্মীয় বিষয়াদির তাৎপর্য গুরুত্ব অস্বীকার করার যুক্তি কী? অথচ এগুলোর বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানসিক প্রতিকার ও আত্মিক সংস্কারের সাথে এগুলোর সম্পর্ক, নবুয়তের দৃষ্টি ব্যতীত এগুলো দেখা যায় না। আরো মজার ব্যাপার এই যে, তাদেরই একজন পণ্ডিতের রচনা আজায়েবুল খাওয়াস গ্রন্থে দু'টি নকশা অঙ্কিত রয়েছে। সেখানে লেখা আছে যে, প্রসব বেদনায় আক্রান্ত কোন মহিলা এদের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে, পরে নকশা দু'টিকে পদদলিত করবে তবে অবিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ট হবে। এসব স্থবির বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর সম্ভাব্যতাকেও বিশ্বাস করে। প্রশ্ন হলো যে, দ্রব্যগুণকে যারা এভাবে স্বীকার করে তাদের মস্তিষ্কে এ বিষয় কেন ঢুকে না যে, ইবাদতের কল্যাণও তদ্রূপ স্বীকার করা উচিত। বিশ্বাস করা উচিত যে, ফজরে দুই রাকাত, জোহরে চার রাকাত এবং মাগরিবে তিন রকাত প্রভৃতি গাণিতিক বিভিন্নতায় মঙ্গল নিহিত আছে। নবুয়তের সাহায্যেই শুধু সেকথা জানা যেতে পারে। নকশা নিম্নরূপ–

৬	১	৮
৭	৫	৩
২	৯	৪

د	ط	ب
ج	ه	ز
ح	ا	و

আমরা যতই বুঝার চেষ্ট করি যে নামাযের গাণিতিক ফারাক সম্পর্কিত উপকারিতা এর সময়ের বিভিন্নতার সাথে জড়িত, তা তারা বুঝবে না এবং অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেবে। বর্ণনা পরিবর্তন করে যদি আমরা বলি যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের অস্তাচলগামী সূর্য এবং অস্তগামী সূর্য প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া আছে তা তারা স্বীকার করে। শুধু তাই নয়, এর ভিত্তিতে তারা জীবনপঞ্জি রচনা করে এবং জীবন মরণের ভাবিষ্যদ্বাণী করে। তবে একই কথা নামাযের সম্বন্ধে বললে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা পাগল হয়ে যায়। এর যৌক্তিকতা কী? পরীক্ষিত মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীর কথা তারা বিশ্বাস করে, অথচ মিথ্যার অপবাদ থেকে পুরোপুরি পবিত্র নবিদের কথা তারা বিশ্বাস করবে না।

মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীর প্রতি তারা গভীর বিশ্বাসী। সে যদি বলে যে সূর্য যখন মধ্যাস্থ আকাশে আসে এবং অমুক তারকা এর সামনাসামনি হয়, তখন তোমরা নতুন কাপড় পরবে না নতুবা তোমরা মারা যাবে। তৎক্ষণাৎ তারা তা বিশ্বাস করবে। শীতের আঘাতে জর্জরিত হবে তথাপিও তারা নতুন কাপড় পরিধান করতে রাজি হবে না। তারা বিশ্বাস করে যে, এতে প্রকরণ ও প্রতিক্রিয়া নিহিত রয়েছে। কিন্তু নবিদের মুজিযার প্রসঙ্গে তারা বিগড়ে যায় এবং তাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় না যে, যে কোন অজ্ঞাত কারণে এ সব অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে।

দর্শনের ভক্তরা মানতে রাজি আছে যে, ওষুধের ক্রিয়া হয় এবং তারকার গতিবিধি মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তবে নামাযের রাকাতের সংখ্যাগত পার্থক্য, হাজিদের পাথর নিক্ষেপ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও যে অর্থহীন নয় এ কথা মানতে তারা রাজি নয়।

মূলত দুয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এ উভয়ের মধ্যেই বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেউ হয়ত বলতে পার যে, ওষুধ ও নক্ষত্র সংক্রান্তে আমরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এবং এদের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, ফলে আমরা এদের প্রভাবকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। নবুয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের কোনই অভিজ্ঞতা নেই। বিনা দলিলে কী করে আমরা এগুলো স্বীকার করি? উত্তরে আমরা বলব? তোমাদের এ দাবি সত্য নয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তোমরা ডাক্তার ও জ্যোতিষীর কথার বিনা পরীক্ষায় আস্থা স্থাপন কর এবং অনুভাবে তাদের কথা বিশ্বাস কর।

এমতাবস্থায় নবুয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারে নবিদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা অযৌক্তিক হবে কেন? নবিগণ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলোর যথার্থ উপলব্ধি করেছেন। তাদের অনুকরণের মাধ্যমে এদের অন্তর্নিহিত কল্যাণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মনীষী ইমাম গাজ্জালী (র)-এর উপদেশ

[এটি মনীষী গাজ্জালী (র)-এর জনৈক শিষ্য কর্তৃক তাঁর নিকট প্রেরিত কতিপয় প্রশ্ন সংবলিত একটি চিঠির উত্তরে শিষ্যকে প্রদত্ত মনীষীর উপদেশাবলি।]

প্রশ্ন: বিশ্ববরণ্যে জ্ঞানতাপস মনীষী ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী (র)-এর একজন শিষ্য দীর্ঘদিন যিনি জ্ঞানের সাধনায় তাঁর সেবা করেছেন একদা আত্মবিশ্লেষণে উপলব্ধি করেন এবং ইমাম গাজ্জালীকে লিখেন যে, আমি পুরো জীবন জ্ঞানের সাধনা করেছি এবং বরণ করেছি এ পথে সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা। কিন্তু আমি আজও অনবহিত, এত কষ্টে অর্জিত আমার জ্ঞানরাজির কোন অংশ আমার জন্য কল্যাণপ্রসূ আখেরাতে আমার জন্য উপকারী আর কোন অংশটি হবে আমার কবরের সাথি এবং হাশরে দিশারি। এমনকি জানি না, এ সাধিত জ্ঞানের কোন অংশ গ্রহণীয় বা দরকার আর কোন অংশ অপ্রয়োজনীয় বা পরিত্যাজ্য তা-ও। অথচ জ্ঞানের ব্যাপারে এটিই জ্ঞাতব্য। কারণ, বিশ্বনবীর প্রার্থনা, হে প্রভু! নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান তেকে তুমি আমায় মুক্ত রাখ।

এ উপলব্ধির ব্যাপারে উক্ত শিষ্য আপন সংশয় ও দ্বিধাযুক্ত বিষয়সমূহ কতিপয় প্রসঙ্গিক প্রশ্নসহ স্বীয় গুরু মনীষী গাজ্জালী (র) নিকটে পেশ করেন দরখাস্তাকারে, তাঁর উপদেশ প্রার্থনায়। পত্রে শিষ্য নিবেদন করেন: আপনার বিভিন্ন গ্রন্থে আমার যাবতীয় প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তথাপি এসব বিষয়ে আপনার উপদেশসমূহ দয়া করে, সংক্ষিপ্তকারে আমাকে লিখে দিন, আমার জীবনে তা সার্বক্ষণিক পথনির্দেশক ও প্রাত্যাহিত দিশারির কাজ করবে।

ইমাম গাজ্জালী (র) জবাবে লিখেছেন:

হে প্রিয় বৎস! তুমি দীর্ঘজীবি হও এবং সৎপথে থেকো। বিশ্বনবির নির্দেশসমূহ সারা পৃথিবীতে সম্প্রচারিত, তা তুমি অবহিত। সঠিক পথপ্রাপ্তিতে, সকলের ন্যায় তোমার ক্ষেত্রেও তা-ই যথেষ্ট হওয়া উচিত।

তাঁর নির্দেশসমূহের অংশবিশেষ তোমার স্মরণ থাকলে আমার উপদেশের তোমার কোন দরকার নেই। আর তার কিছুই যদি তোমার স্মরণ না থেকে থাকে, তাহলে আমার সাথে কাটানো বছরগুলোতে আমার কাছ থেকে কী শিখেছ?

প্রিয় বৎস! বিশ্বনবির সাথিবর্গ কর্তৃক সংগৃহীত বাণীগুলোর মাঝে এটি বিশেষ অনুধাবনীয়–

আল্লাহর বান্দাদের নিষ্প্রয়োজন সাধনায় নিমগ্নতা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টির নিশ্চিত লক্ষণ। অন্তত নিজেরও কোন কাজে আসে না, এমন কোন কাজে জীবনের একটি মুহূর্তও যে নষ্ট করে, পরিমাণে সে-ই হয় বৃহত্তর ধ্বংসের উৎস। চল্লিশ বছর বয়সেও পুণ্যাত্মা দ্বারা যার পশুবৃত্তির নিয়ন্ত্রিত হয় না, তার জন্য নরকের প্রস্তুতিই সমীচীন।

আমি নিশ্চিত এ কয়টি কথাই সর্বকালে সবার জন্য যথেষ্ট। হে বৎস! উপদেশ আমি তোমার দিতে পারি , আমার পক্ষে এটি মোটেই কঠিন কাজ নয়। তবে উপদেশ গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন খুবই কষ্টকর। কারণ ইন্দ্রিয়জ স্বভাব এবং লালসাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট উপদেশ অত্যন্ত বিস্বাদ। আর এটি অতি মধুর বিশেষত যারা বৈষয়িক জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত এবং সামাজিক মর্যদা লাভে সচেষ্ট তাদের নিকট। জ্ঞানসর্বস্ব ব্যক্তি বিশ্বাস করে একমাত্র জ্ঞানই তার মুক্তির উপায়। এটি নাস্তিক দার্শনিকদের অন্যতম ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস। এরা কর্মবিমুখ এটাই এর কারণ। বস্তুত কর্মই হওয়া উচিত জ্ঞানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞাত হও, স্বীয় জ্ঞানানুযায়ী যে জ্ঞানী কাজ করে না সে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হবে। তুমি হয়ত জান না, বিশ্বনবি বলেছেন:

যে, জ্ঞানী স্বীয় জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না, বিচার দিবসে সে কঠোর আজাবের শিকার হবে।

কোন একটি এ গন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত জোনায়েদ বাগদাদীর সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ হয় এবং বাগদাদীকে তিনি প্রশ্ন করেন–

কেমন আছেন হে জোনায়েদ?

কয়েকটি দোয়া যা আমি মাঝরাতে পড়তাম, তা ব্যতীত আমার যত লেখাপড়া ও গ্রন্থরাজি সবই আজ অদৃশ্য বিলুপ্ত ও বেকার, কিছুই আমার কোন উপকারে আসছে না জবাব দিলেন জোনায়েদ।

কথা বন্ধ করে শুধু কাজ কর, এখানে কাজ ব্যতীত আর কোন কিছুরই এতটুকু মূল্য নেই।

হে বৎস। তুমি কখনো কর্মে অলসতা করবে না এবং উদ্দেশ্য সাধনে সদা সচেষ্টা থাকবে। কারণ, শুধু জ্ঞান কারো কল্যাণ করতে পারে না।

তোমার প্রচুর জ্ঞান অর্জন ও বিশাল গ্রন্থাগার সবই ব্যর্থ যদি এতে তোমার ব্যবহারিক জীবন উন্নত না হয়। হে বৎস, তুমি যদি কল্যাণ কর্মপরায়ণ না হও আর উন্নত করতে না পার নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহপাত্র হিসেবে তবে তিনি তোমাকে স্বীয় কল্যাণ সমৃদ্ধ করবেন না।

মানুষ স্বীয় কৃতকর্মের দ্বারা যা চায় তা ছাড়া কিছুই পায় না।

আল্লাহর দর্শনের সৌভাগ্য লাভে ইচ্ছুক বক্তিকে নিশ্চয় কল্যাণ কর্মপরায়ণ হতে হবে। যে যা করে সে তারই ফল ভোগ করে।

আল্লাহে বিশ্বাসী এবং কল্যাণকর্মশীলের জন্যই সজ্জিত রয়েছে স্বর্গীয় সবুজ বাগান ও অনন্তকাল সে সেখানে থাকবে। ইসলাম ধর্ম পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁর নবি, এ বিশ্বাস।

২. নামায প্রতিষ্ঠা করা।

৩. উপবাস ব্রত পালন, রমযান মাসে রোযা রাখা।

৪. যাকাত (অর্থাৎ সঞ্চিত সম্পদে বঞ্চিতের পাওনা) দেওয়া।

৫. সামর্থ্যবানের জন্য হজ পালন করা।

এ পাঁচটি মৌল ভিত্তিকে মুখে স্বীকার করতে হবে, বিশ্বাস রাখতে হবে অন্তরে দৃঢ়ভাবে এবং অনুশীলন করতে হবে এগুলোকে বিধিবদ্ধ বিধান অনুযায়ী।

শুধু জ্ঞান নয়, একমাত্র কর্মই মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত, এর অধিক জানার তোমার প্রয়োজন কী? আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে কোন মানুষই শুধু কর্মের কল্যাণে স্বর্গ পাবে না। তুমি যদি এ প্রশ্ন কর আমি বলব তুমি আমার বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝ নি। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ স্বর্গে যাবে, তা আমি বলি নি। মানুষের স্বর্গ লাভের উপযুক্ততা তাকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে কল্যাণ কর্ম ও বিনীত আরাধনার মধ্য দিয়ে। আল্লাহ বলেন: সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহ কল্যাণ কর্মশীলদের নিকটতম।

তা স্বীকার করি। আল্লাহ-বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্বর্গে যাবে। অবশ্য কত অপরাধের শাস্তি ভোগের পর এবং সেখানে গিয়েও সে প্রায় নিঃস্বই থাকবে। কেননা, কর্ম ও শ্রমেই কেবল বিনিময় লাভ হয়। হে প্রিয় বৎস! অনুধাবন কর বিশ্বনবির বাণী:

আত্মবিশ্লেষণ কর পরীক্ষায় অবতরণের আগে এবং ওজন কর স্বীয় সম্পদ নিক্তিতে স্থাপিত না হতেই।

হজরত আলী (রা) বলেছেন, কর্ম ব্যতীত স্বর্গে যাবে এটা যারা ভাবে, তারা বৃথা আশার ছলনে রয়েছে এবং যে মনে করে আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত শুধু কর্মের কল্যাণেই স্বর্গ লাভ হবে সে করছে পণ্ডশ্রম।

স্বর্গের সাধনা ব্যতীত স্বর্গের আশা করা সর্বনিকৃষ্ট পাপ বা অপরাধ, বলেছেন, সাধক হাসান বসরী।

এ প্রসঙ্গে মহানবির এ বাণীটিও প্রণিধানযোগ্য:

আল্লাহর অনুগত এবং সকল যুগের মঙ্গল আশায় কল্যাণকর্মে রত এমন ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রজ্ঞাবান, আর যে ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুতুলবৎ পরিচালিত হয়েও আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী সে বোকার স্বর্গে আছে।

হে বৎস! অনেক রাত তুমি বই পড়ে কাটিয়েছ। আমি জানি না কেন তুমি তা করেছ। যদি তুমি এটা করে থাক বৈষয়িক জ্ঞান কিংবা বন্ধু স্বজন সমাজে খ্যাতির আশায় তাহলে তোমার জন্যে আক্ষেপ। অপর দিকে এ দ্বারা যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় ইসলামের প্রসার, বিশ্বনবির আদর্শ বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি স্বীয় চরিত্র উন্নয়ন তবে অবশ্যই তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে এবং তুমি আমার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

হে বৎস! জেনে রেখ, কর্মহীন জ্ঞান মূল্যহীন, আর জ্ঞানহীন কর্ম নিষ্ফল। যে জ্ঞান আজ তোমাকে পাপমুক্ত রাখতে পারে না, সাহায্য করতে পারে না শুধু জীবনযাপনে তা কী করে রক্ষা করবে তোমাকে পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে। তুমি যদি কোন কাজ না কর। কিংবা কৃতকর্মের ধ্যান না কর বিচার দিবসে তুমি চিৎকার করে বলবে আমাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নাও, কিছু ভাল কাজ করে আসি। উত্তরে ফেরেশতারা বলবে তুমিও পৃথিবীতে থেকেই এসেছ, হে মূর্খ!

সুতরাং, হে বৎস! আপন রিপুসমূহ সংযত কর সাহসের সাথে দৃঢ়ভাবে এবং সদা প্রস্তুত থাক মৃত্যুর জন্য। কবরই তোমার প্রকৃত বাসগৃহ। যা তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে উপযুক্ত প্রস্তুতি ব্যতীত সেখানে তোমার যাওয়া উচিত হবে না।

হে বৎস! তোমার জানতে হবে, প্রকৃত আরাধনা কী? এটাই তোমার প্রতি আমার উপদেশের মূল কথা। বিশ্বনবি প্রবর্তিত পদ্ধতিতে তার আদর্শের অনুসরণ করা এবং তার নিষিদ্ধ কর্ম হতে বিরত থাকাই প্রকৃত আরাধনা। আর এটাই আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের নিরেট পরিচায়ক। অতএব তোমার সকল দ্বিধা সংকোচ ত্যাগ করে কর্মে রত হওয়া উচিত। তাঁরই রচিত নিয়মানুসরণে তোমার বিশ্বাস রাখা উচিত দৃঢ়ভাবে। তোমার সাধিত কোন জ্ঞানই তোমাকে সঠিক পথে অধিষ্ঠানে সক্ষম নয়। আবার ভ্রান্ত দর্শন এবং ভণ্ড সুফিদের ভুল চিন্তাধারা ও হাস্যকর অনুষ্ঠানাদি জীবন সাধনার সাফল্যে কখনও সহায়ক নয়। আত্মস্বার্থের হীন লালসাকে সদা নিয়ন্ত্রণ এবং সদগুণাবলির অস্ত্রে পশুবৃত্তিকে বধ করেই শুধু তুমি জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে

পার। সাফল্যের সাথে যাদু বা অতিউৎসাহবাদীদের মধ্যস্থতায় নয়। তুমি নিষ্ফল সাধনায় সময় নষ্ট করবে না এবং নিরাপদ রাখবে তোমার মনকে আত্মপ্রসাদ ও স্থুল জৈবিক আনন্দের হামলা থেকে। কারণ এগুলো সবই নিশ্চিত ধ্বংসের মূল। তুমি প্রকৃত আরাধনায় আত্মনিবেদন কর এবং অনুসরণ কর অনুশীলনের বিধেয় পদ্ধতি। নতুবা আলোকজ্জ্বল হবে না তোমার আত্মাস্বর্গীয় আলোয়।

হে প্রিয় বৎস! বুঝালেও বুঝবে না, এমন কিছু প্রশ্নও তুমি করেছ। অবশ্য সে স্তরে পৌঁছলে, তুমি নিজেই তা বুঝতে সমর্থ হবে। সে স্তরে পৌঁছতে ব্যর্থ হলে এসব প্রশ্ন তোমার কিছুতেই বোধগম্য হবে না। কেননা এদের উপলব্ধি হয় আস্বাদনে, লেখায় অথবা বলায় এগুলো বোধ হয় না। যেমন তুমি পার না মিষ্টি ও লবণের স্বাদ বুঝাতে। সাধক লিখিত বা বাচনিক উত্তর সম্ভব, তোমার শ্রেণির প্রশ্নগুলোর বিশদ আলোচনা রয়েছে আমার এহইয়াউল উলুমসহ বিভিন্ন গ্রন্থে। এগুলোর বিস্তারিত আলোচানা আমার পক্ষে এখানে সম্ভব নয়। সহজে উপলব্ধির লক্ষ্যে আমার মিনহাজুল আবেদীন গ্রন্থখানা বার বার পড়বে। নেহায়েত তুমি জানতে চেয়েছ কাজেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

তুমি একজন সাধক বা আল্লাহর প্রেমিকের বৈশিষ্ট সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছ তবে শুন:

১. সুদৃঢ় ও অবিচল বিশ্বাস।
২. অন্যায় কর্মে সম্পূর্ণ বিরতি।
৩. প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনের দ্বারা শক্রর সন্তুষ্টি বিধান।
৪. আল্লাহর নির্দেশাবলির উপলব্ধি ও অনুশীলনের জন্য আবশ্যিক ধর্মজ্ঞান।

এর অধিক জ্ঞান আবশ্যক নয়। তবে প্রয়োজনে যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টিতে আরো বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শিবলী (র) সম্পর্কে কথিত আছে, একদিন তিনি বলেছেন, আমি চারশত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেছি এবং শিখেছি তাদের নিকট মহানবির চার হাজার বাণী। এর একটি ব্যতীত আর কোনটি গ্রহণ করি নি। তা হলো তুমি তোমার ইহকালীন উন্নতির চেষ্টা করবে, এখানে তোমার অবস্থানকালের অনুপাতে। আর পরকালীন কল্যাণে সাধনা করবে, সেখানে তোমার অনন্তকাল বাসের কথা স্মরণ রেখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সর্বশক্তি ব্যয় করবে, আর নরকের জন্য করবে, যতটা নরকযন্ত্রণা তুমি সহ্য করতে পারবে।

হে প্রিয় বৎস! এতক্ষণে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ যে, প্রচুর জ্ঞানের তোমার কোন দরকার নেই, প্রচুর জ্ঞান আবশ্যক নয়, বরং ঐচ্ছিক।

বর্ণিত আছে, হাতীমের শিক্ষক শাকিক বলখি একদিন তাকে জিজ্ঞসা করেন, হে হাতীম! তুমি কতদিন থেকে আমার সাথে আছ?

ঃ তেত্রিশ বছর, হে শিক্ষক! উত্তর দেয় হাতীম।

ঃ এ সময়ে আমার নিকট থেকে তুমি কী শিখেছ এবং তাতে কী পরিমাণ উপকৃত হয়েছ? প্রশ্ন করেন শিক্ষক মহোদয়।

ঃ জনাব, এ সুদীর্ঘ সময় আপনার সেবায় থেকে যে সব জ্ঞান আমি অর্জন করেছি তা দ্বারা মাত্র আটটি বিষয়ে আমার শিক্ষা হয়েছে। আবার অন্য জ্ঞান দ্বারা আমার আর কোনই উপকার হয় নি, বিনীতভাবে উত্তর দেয় শিষ্য হাতীম।

উত্তরে মনীষী শকিক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, পুরো জীবন আমি তোমার জন্য পরিশ্রম করলাম, আর তুমি কিনা মাত্র ৮টি বিষয় ব্যতীত কিছুই আমার থেকে শিখতে পার নি?

ঃ বস্তুত এ আটটি বিষয় শেখা হলে, আর কিছু আমি শিখতেই চাই নি আর আমি নিশ্চিত যে আমার উভয় জীবনের মুক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট উত্তর দেন শিষ্য।

ঃ এ আটটি শিক্ষা কী? সাগ্রহে প্রশ্ন করেন সাধক শুরু শকিক তার এটাই যথেষ্ট, জবাব দেন শিষ্য হাতেমকে। হাতীম উত্তর দেনঃ

১. আমি উপলব্ধি করেছি, পৃথিবীর সব মানুষ ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের প্রেমে পাগল এবং আসক্তিতে উম্মাদ, আর এ উম্মাদনা কবরে নিঃসঙ্গ নির্বাসনের পূর্বে কাউকেই ছাড়ে না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কবরে যা আমার সাথি হবে এমন বস্তু ব্যতীত কিছুকেই আমি ভালবাসব না এবং আমার কৃতকর্ম ছাড়া কিছুই কবরে আমার সাথি হতে পারবে না। গভীর ধ্যানেও আমি এ জ্ঞান পেয়েছি।

সুতরাং আমি ঠিক করেছি–

"কর্মই আমার বন্ধু এবং তা ই আমার ভালবাসার পাত্র।"

ঃ উত্তম করেছ, সোৎসাহে মন্তব্য করেন, শিক্ষক শকিক।

২. বিশ্বমানবকে বিশ্লেষণ করে আমার উপলব্ধি হলো সকল মানুষই স্বীয় রিপু ও কামনার দাস। এ পর্যায়ে আমি স্মরণ করি কোরআনের এ বাণী:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিনীত ও ভীত এবং যার রিপু সংযত ও নিয়ন্ত্রিত, সন্দেহ নেই যে, সে বেহেশতগামীদের দলভুক্ত।"

সুতরাং আমি আমার রিপুসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হই এবং আমি কখনো তাদের কোন নির্দেশ পালন করি নি। পরিণামে এ সংগ্রামে আমি বিজয়ী হয়েছি, বাধ্য করতে পেরেছি তাদের সত্যের কাছে নতি স্বীকার এবং অংশগ্রহণে আমার সাথে আল্লাহর আরাধনায়।

ঃ তুমি আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্ত হও, মন্তব্য করেন শিক্ষক।

৩. এবার আমি তাকালাম পৃথিবীর দিকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে। দেখলাম, সবাই পার্থিব সম্পদের পিছনে ছুটছে আদা জল খেয়ে এবং রবণ করছে তারা সব ধরনের যন্ত্রণা সম্পদ আহরণের এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টায়। ভাবলাম কোরানের এ উদ্ধৃতির কথা:

"তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে সবকিছুই চিরস্থায়ী।"

এ পর্যায়ে অবিলম্বে আমার জীবনের সকল সঞ্চিত সম্পদ আমি অভাবীদের বিলিয়ে দেই এবং নিশ্চিন্তবোধ করি, এ সব আল্লাহের নিকটে জমা রেখেছি এ কথা ভেবে।

ঃ যথার্থ করেছ, সানন্দে মন্তব্য করেন তার শিক্ষক শকিক।

৪. বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে আমি চিন্তা করে দেখলাম, একদল ভাবে অসংখ্য উত্তরাধিকারী ও বিরাট পরিবারই তাদের সম্ভ্রম ও মর্যাদার উৎস। অন্যেরা বিশ্বাস করে বিপুল অর্থ সম্পদের মধ্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার ভিত নিহিত। অপর এক শ্রেণির ধারণা, অধীনস্থদের উপর দৌরাত্ম্য করার ক্ষমতা এবং তাদের নির্যাতন ও নিষ্পেষণের পটুতাই শাসন যোগ্যতা। তখন আমি স্মরণ করি কোরআনের এ বাণী:

"তোমাদের মাঝে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীতু ও সাবধানী।"

সুতরাং আমি ধর্মপরায়ণতা ও সদাচরণ অভ্যাস করি, আল্লাহর মনোনীতদের দলে স্থান লাভের আশায়।

ঃ উত্তম করেছ, বললেন শিক্ষক।

৫. এবার আমি জনসমাজের প্রতি লক্ষ করলাম, এরা একে অন্যের শত্রু এবং পরস্পর কুৎসা বর্ণনায় লিপ্ত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিত্তবানদের সাথে অবহেলিত বিত্তহীনদের পারস্পরিক ঈর্ষা ঘৃণাই এর মূল কারণ। তখনই আমি কোরআনের এ বাণী স্মরণ করি:

"আমি পৃথিবীর সবাইকে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিয়েছি।"

এ থেকে আমি অবহিত হলাম, সৃষ্টির মুহূর্তে বিধিলিপি রচনাকালে সব মানুষের জীবিকা, মর্যাদা ও সম্পদ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে এবং এসব বিষয়ে কারো কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নেই। অতএব আমি সিদ্ধান্ত করি, ঈর্ষা রাখব না, আর আমি থাকব স্বীয় সম্পদে যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি ভাগ্য বলে এবং এভাবেই প্রতিষ্ঠা করব আমি সমঝোতা সকলের সাথে।

ঃ শকিক বললেন, উত্তম করেছ, হে হাতীম!

৬. শিক্ষিত শ্রেণির প্রতি লক্ষ করলেই আমার উপলব্ধি হলো, হয়ত বা সে কারণে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে হীন ভাব পোষণ করে। এখানে আমি স্মরন করি কোরআনের এ বাণী:

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। এর সাথে তোমাদের দুশমনের মতোই ব্যবহার করা উচিত।"

অতএব আমি অবগত হলাম, একমাত্র শয়তানই আমার শত্রু এবং শয়তানের সাথি ছাড়া কেউ আমার প্রতি শত্রুভাব পোষণ করতে পরে না। সুতরাং শত্রু ভাবতে শুরু করি আমি শয়তান ও তার অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করি তাদের সকল পরামর্শ এবং লিপ্ত হই আল্লাহর আরাধনায় স্বীকৃত যথার্থ পদ্ধতিতে সব সময়ের জন্য। স্বয়ং আল্লাহ বলেনঃ

"হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নিকট থেকে এ শপথ গ্রহণ করি নি যে, তোমরা শয়তানের পূজা কবে না? কারণ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং তোমরা শুধু আমারই আরাধনা করবে এবং তোমাদের জন্য সঠিক মুক্তির পথ এটাই।"

ঃ ঠিকই করেছ, হে প্রিয় বৎস! মন্তব্য করেন শকিক

৭. পৃথিবীর মনুষের দিকে তাকিয়ে যখন আমি উপলব্ধি করি যে, তারা সবাই বৈষয়িক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লিপ্ত এবং আরো পাওয়ার লিপ্সা নিয়ে গেছে তাদের অধঃপতনের শেষ প্রান্তে, ভুলে গেছে তারা ন্যায় অন্যায় পার্থক্য তখন আমি স্মরণ করি কোরানের এই বাণী:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই, আল্লাহ স্বয়ং যার জীবিকার দায়-ভার গ্রহণ করেন নি।"

কাজেই আমার উপলব্ধি হলো, আমিও তো তাঁরই অন্যতম সৃষ্টজীব। আমার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, যথাসময়ে তা আমার নিকট পৌঁছানোর নিশ্চয়তা বিধানও করবেন তিনিই।

ঃ অতি উত্তম, বলেন শিক্ষক।

৮. বিশ্ববাসীর প্রতি তাকিয়ে যখন জানতে পারলাম যে, তারা প্রত্যেকেই এই বা সেই বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভ রশীল, কেউ নির্ভরশীল স্বীয় সম্পদে কেউ সম্রাজ্যে কেউ শুধু শঠতায় আর কেউ-বা তারই মতো অপর ব্যক্তিতে। স্মরণ করি আমি কোরআনের এই বাণী:

"যে ব্যক্তি সব ছেড়ে শুধু আল্লাতেই নির্ভরশীল হয় সে দেখতে পাবে যে, তার জন্যে আল্লাই যথেষ্ট।"

কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আল্লাহ্ ছাড়া কারো উপর ভরসা করব না, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য।

আটটি দফা মনোযোগ দিয়ে শুনে, মনীষী শকিক মন্তব্য করেন

ঃ আল্লাহ তোমার সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা দান করুন এবং ক্ষমতা দিন তিনি তোমাকে অনুরূপ কর্ম সম্পাদনের। আমি মূসা (আঃ) ঈসা (আঃ) ও দাউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলি ও কুরআন আদ্যোপান্ত পড়েছি, দেখেছি তোমার আটটি নীতি তাতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং চারটি পবিত্র গ্রন্থেই গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে এগুলোর প্রতি বিশেষভাবে। যে ব্যক্তি উক্ত নীতিগুলো অনুসরণ করে কর্ম করে প্রকৃতপক্ষে সে এ চারটি পবিত্র গ্রন্থের অনুশীলনকারী।

অতএব হে প্রিয় বৎস! উক্ত বক্তব্য থেকে তুমি পরিষ্কার বুঝেছ যে, প্রচুর জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন জ্ঞানানুযায়ী কর্মের।

সুফিবাদ

প্রিয় বৎস তুমি আধ্যাত্মবাদ সম্মর্কে আগ্রহ পকাশ করেছ। তবে শুনে রাখ, আধ্যাত্মবাদে মৌল উপাদান দু'টি আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা ও মানব সেবা। আল্লাহর প্রতি অকপট এবং মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদিত ব্যক্তিই সুফী। আল্লাহর অকপট হওয়া বা নিবিষ্টতা অর্থ তাঁরই আদেশ মোতাবেক যাবতীয় প্রকার প্রবৃত্তির পূজা বর্জন করা। আর মানব সেবা অর্থ ইসলামের মূলনীতি বিরোধী নয় এমন সকল ক্ষেত্রে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সুফিপদবাচ্য নয়, যদি সে তা দাবি করে সে জঘন্য মিথ্যাবাদী।

আনুগত্য

তুমি আনুগত্য অর্থ জানতে চেয়েছ। এটি তিনটি মৌল উপাদানে গঠিত। ইসলামের মৌলনীতি অনুসরণে জীবন যাপন, দৈবাদেশে সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক স্বীয় কামনা বাসনা ত্যাগ ও বিধিলিপিতে বিশ্বাস এবং আল্লাহর নির্ধারিত বস্তুতে তৃপ্তি ও তুষ্টি।

নির্ভরতা

তুমি নির্ভর বা তাওয়াক্কুলের অর্থও জানতে চেয়েছ। এটি হলো আল্লাহর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় আস্থা স্থাপন এবং অবিচল ভাবে বিশ্বাস করা যে, তোমার জন্য নির্ধারিত বস্তু অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছবে। সারা বিশ্বের মিলিত প্রচেষ্টাও তা থেকে তোমায় বঞ্চিত করতে সক্ষম হবে না এবং যা তোমার ভাগ্যে নেই, সারা বিশ্বের সম্মিলিত শক্তি দিয়েও তুমি তা আয়ত্বে আনয়নে সমর্থ হবে না।

নিষ্ঠা

তুমি নিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে চেয়েছ। আল্লাহের ইচ্ছায় কর্ম করার নামই নিষ্ঠা। সকল কর্মে বৈষয়িক স্বার্থের সমস্ত মানবিক কামনা-বাসনা থেকে মন-প্রাণ সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার নামই নিষ্ঠা। মানুষের জন্য শাস্তি কামনা অথবা তাদের দুঃখে বিচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ ব্যতীত কারো শ্রেষ্ঠত্বে তোমার মন আচ্ছন্ন হলেই প্রবেশ করবে তোমার মধ্যে কপটতা। পাথরের যেমন কোন ইচ্ছা শক্তি নেই এবং নেই আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি মানুষ সাধারণত আত্মনির্ভর হলেও আল্লাহর ইচ্ছার নিকট তেমনই অসহায়। মানুষসহ সকল সৃষ্টির দুর্বলতা ও অসহায়তায় বিশ্বাসী না হলে আল্লাহর প্রতি তোমার বিশ্বাস কপটতামুক্ত হতে পারে না।

হে প্রিয় বৎস! তোমার অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমার বিভিন্ন কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তুমি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে তা জেনে নিতে পার। তোমার কতিপয় প্রশ্ন গোপন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর আলোচনা আমার জন্য নিষিদ্ধ। তুমি যতটা জেনেছ, সে মোতাবেক কাজ কর। আর যা এখনো তোমার জানা হয় নি, ধীরে ধীরে জানতে পারবে।

হে বৎস! অতঃপর তুমি যদি কোন বিপদে পতিত হও, সরাসরি নয়, শুধু ধ্যানের মাধ্যমেই প্রয়োজনে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে।

কারণ আল্লাহ বলেন:

"তারা তোমার আগমন অবধি যদি তোমার অপেক্ষায় থাকত তোদের জন্য তা কল্যাণ হতো।"

সুতরাং হজরত খিজিরের উপদেশ গ্রহণ কর এবং সে অনুযায়ী কাজ কর।

আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন আমি নিজে ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না, যথা সময়ে তোমাক তা জানানো হবে।

আল-কুরআনের অন্য জায়গায় তিনি বলেন– আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করবো।

অতএব ব্যস্ত হয়ো না।

তুমি যখন সে স্তরে পৌছবে ঠিক সময়মত সব কিছু জানতে পারবে এবং নিজেই দেখতে পাবে সব স্বচক্ষে।

স্মর্তব্য যে, ঠিক স্তরে পৌছতে না পারলে কিছুই দেখা যাবে না। কেননা, আল্লাহ বলেন ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তা দেখার জন্য তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে নি?

করণীয় ও বর্জনীয়

হে বৎস! এখানে আমি তোমাকে চারটি করণীয় এবং চারটি বজনীয় এই আটটি কাজের নসিহত করব। এ উপদেশগুলো পালনে, অহংকার ঈর্ষা এবং তদ্রূপ দোষের আকর। সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা অনুমোদনীয় তবে তা দ্বেষমুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

দ্বেষমুক্ত আলোচনায় দু'টি বৈশিষ্ঠ থাকা উচিত:

১. ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য হওয়া জরুরী। ন্যায় কথা, তোমার শত্রু হলেও স্বীকার করতে হবে। নিজের ব্যক্তব্যই সঠিক তোমার এরূপ অহমিকা থাকা উচিত নয়।

২. দ্বেষ-মুক্ত আলোচনা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা প্রকাশ্যে নয়, একান্তে ও নিভৃতে অনুষ্ঠিত হবে।

এ প্রসঙ্গে তোমার আরো জানা উচিত যে, অজ্ঞতা থেকে চার রকম রোগ জন্মায়। এদের তিনটিই দুরারোগ্য আর একটি মাত্র নিরাময়যোগ্য। হিংসা এদের মাঝে প্রথম ও প্রধান। এ দুরারোগ্য, হিংসাপরায়ণ ব্যক্তির প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তুমি দিতে পার। তবে এতে সে তৃপ্ত হবে না; বরং তার হিংসাই বড়বে। অতএব এক্ষেত্রে তোমাকে নীরব থাকতে হবে। হিংসুটে লোক তার মনের হিংসাং নিজেই দগ্ধ হয়।

মহানবি বলেন: আগুন যেমনি জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে তেলকে, তেমনি ভস্মিভূত করে হিংসা হিংসুকের যাবতীয় সুমহান গুণাবলিকে।

দ্বিতীয় রোগ বোকামী, এরও কোন চিকিৎসা নেই। হজরত ঈসা (আ) একদিন বলেন, আমি মৃতকে প্রাণ দান করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি বোকাকে সংশোধন করতে। এ প্রকার লোকেরা সামান্য শিখেই শিক্ষক স্থানীয় বিদ্বানদের সমালোচনায় লিপ্ত হয়। বোকা অজ্ঞতার ভিত্তিতে তর্ক করে বিদ্বান তা জানে বলে তার সমালোচনায় তিনি কান দেন না। অতএব তুমিও এদের এড়িয়ে চলবে এবং এদের সাথে কখনো তর্কে লিপ্ত হবে না।

তৃতীয় রোগ মহৎ ব্যক্তিদের বাণী বুঝায় অক্ষমতা। এ প্রকারের লোকেরাও সাধারণ জ্ঞান বর্জিত ক্ষীণ বুদ্ধি এবং সংশোধনের অযোগ্য। তোমাকে এদের প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে, উত্তর দিবে না এদের কোন জিজ্ঞাসার।

চতুর্থ রোগ জ্ঞানের পিপাসা। মূর্খ হলেও এরা জ্ঞান পিপাসু, এদের প্রজ্ঞা ও বোধশক্তি আছে। তবে হিংসা লিপ্সা প্রভৃতি রিপুকে এরা জয় করতে সক্ষম হয় নি। তবে শিক্ষা অর্জন ও সৎপথে চলায় এরা একনিষ্ঠ। সুতরাং এরা সংশোধনযোগ্য।

অতএব এদের যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয় বর্জনীয়: যা তুমি নিজে যথাযথভাবে সদানুশীলনের ব্যাপারে নিশ্চিত নও যে বিষয়ে অন্যকে উপদেশ দিবে না এবং তা প্রচারও করবে না। গভীর ভাবে বিষয়টি চিন্তা করবে। কেননা, হজরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ বলেন, তুমি নিজেকে আগে বিশুদ্ধ করে আমার সমীপে উপস্থিত কর।

তৃতীয় বর্জনীয়: স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী শাসক বা নায়ক, অবৈধ অধিকারী পাপী অথবা কপটকে সম্মান দেখাবে না বা অভিবাদন জানাবে না। তাদের কাছেও যাবে না এবং তাদের মুখ দেখাবে না। তাদের সাক্ষাৎ বিপজ্জনক। দৈবক্রমে তাদের সাথে তোমার দেখা হলেও তাদের প্রশংসা করবে না। কেননা, অত্যাচারী ও পাপী প্রশংসিত হোক, আল্লাহ এটা পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তি অত্যাচারীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে, মূলত আল্লাহর অসন্তুষ্টি পৃথিবীতে স্থায়ী হোক, সে তা-ই চায়।

চতুর্থ বর্জনীয়: উক্ত প্রকারের লোকদের দান, যদিও তুমি নিশ্চিত যে এগুলো বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত উপার্জিত গ্রহণ করবে না। কারণ এদের দান গ্রহণে তুমি এদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং বিনিময়ে তুমি তাদের সমৃদ্ধি কামনা করবে। মূলত এর অর্থ হবে পৃথিবীতে অত্যাচার ও হিংসা স্থায়ী হোক তুমি তা-ই চাও। এটা তাদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি পরোক্ষ সমর্থন।

এতো হচ্ছে যে চারটি কাজ তোমাকে বর্জন করতে হবে তার আলোচনা। এখন আমি বিশদ বিশ্লেষণ করব, সে চারটি কাজ যা তেমাকে অবশ্যই করতে হবে।

প্রথম করণীয়: তোমাকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে তোমার ভৃত্যকে তোমার প্রতি তাকে যেরূপ কর্তব্যনিষ্ঠা দেখাতে হবে বলে তুমি মনে কর, তুমিও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হবে এবং ভৃত্যের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ তুমি পছন্দ কর না এবং তোমার প্রতি যেরূপ আচরণে তোমার চাকর তোমার বিরাগভাজন ও রোষে পতিত হয় তুমিও আল্লাহর সাথে যেরূপ আচরণ করবে না। তোমার বিশ্বাস করতে হবে, তোমার ভৃত্যও তোমারই ন্যায় মানুষ তোমার সাথে তার পার্থক্য নিতান্ত বস্তুগত; এখানে স্মর্তব্য, যে, আল্লাহ কেবল তোমার প্রভুই নন সৃষ্টিকর্তাও বটে। সুতরাং তোমার সাথে তোমার ভৃত্যের পার্থক্য এবং তোমার প্রভু যিনি তোমার প্রভুও বটে, তার সাথে তোমার সম্পর্কের প্রভেদ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাকে সদা সচেতন থাকতে হবে। কোনক্রমেই এই পার্থক্য তোমার ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

দ্বিতীয় করণীয়: অন্যের প্রতি তোমার আচরণ ও মনোভাব তা-ই হওয়া উচিত যা তুমি তাদের কাছে আশা কর। সকলের কাছে তুমি যে ব্যবহার আশা কর, সকলের প্রতি তোমাকেও তা-ই করতে হবে। ধৈর্যের অভ্যাস কর, বিপদে বিচলিত হবে না। কারণ মহানবি ﷺ বলেন ঃ

নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অন্যের জন্যও ঠিক তা-ই পছন্দ করার মানসিকতা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ঈমান বা বিশ্বাস পরিপূর্ণ হতে পারে না।

তৃতীয় করণীয়: তোমার মুক্তির জন্য অপরিহার্য শুধু এতটুকু জ্ঞানই তোমাকে অর্জন করতে হবে। তা ছাড়াও প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক গুণাবলির যথাযোগ্য অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও যাবতীয় কালিমা দূর করে আপন অন্তরের নির্মলতার লক্ষ্য তোমার প্রভুর সাথে সূত্র সংস্থাপনে তোমাকে ধ্যানমগ্নতার অভ্যাস করতে হবে এবং সমৃদ্ধ করতে হবে নিজেকে প্রভুর অসীম প্রেম ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভে। কেননা মহানবি ﷺ বলেলেন–

প্রভু তোমাদের দৈহিক গঠন ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখেন না,
তিনি শুধু দেখেন তোমাদের অন্তর ও উদ্দেশ্যের প্রতি।

চতুর্থ করণীয়: তুমি যদি ইচ্ছা কর, নিজের কিংবা নিজ পরিবারের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করতে পার, তবে তা যেন এক বছরের প্রয়োজনের অধিক না হয়। কারণ, বিশ্বনবির প্রার্থনা তা-ই ছিল। তিনি বলেন–

হে প্রভু! মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য প্রয়োজন অনুসারে জীবিকার ব্যবস্থা করুন, যে আগামী দিনের জন্য জীবিকা জমা রাখে না।

হে বৎস! তোমার সকল জিজ্ঞাসার উত্তর আমি এখানে সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তুমি আমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করবে আর আল্লাহর দরবারে মুনাজাত কালে আমার কথা স্মরণ রাখবে। আমিন! সুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক– **মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী** প্রণীত ও অনূদীত আরো কিছু মূল্যবান বই সংগ্রহ করুন:

- মা'রেফাতের গোপন ভেদ
- সিরাতুল মোস্তাকিম
- কোরআন-হাদীসের আলোকে কেয়ামত অতিনিকটবর্তী
- ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- মিশকাতুল আনওয়ার –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- সৃষ্টির রহস্য –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- সিররুল আসরার –মূল: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ –মূল: আল্লামা জালাল উদ্দিন রূমী (র)
- আল-কওলুল জামিল –মূল: শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)
- ফয়সালায়ে হাফতে মাশয়ালা –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- কাশফুল মাহজুব –মূল: হজরত দাতা গঞ্জেবক্স হাজবেরী লাহোরী (র)
- জিয়াউল কুলুব –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- জা-আল হক্ব –মূল: হজরত মুফতী আহমাদ ইয়ারখান নইমী (র)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের যে কোনো কিতাবের জন্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ISBN : 984-8604-19-7

প্রকাশনায়

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী ও বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র) ফাউন্ডেশন
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : 01552600957

Laboratory Sharmeen Enterprise Bangladesh
Sharmeen World Traders (P)